Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

তৃতীয় বর্ষ ■ সংখ্যা ৪ - নভেম্বর ২০১৩

সাঁকতোড়িয়া ঃ এখানেই ধসে তলিয়ে গিয়েছিল হেনা পরভিন (নিজস্ব চিত্র)

রানীগঞ্জ-ঝরিয়া অঞ্চল ভয়াবহ বিপদের সামনে

সম্পাদকীয়

ঘূর্ণিঝড় এবং ত্রাণব্যবস্থা

কয়লাখনিতে লাগাতার খনি দুর্ঘটনা চলছে
কর্তৃপক্ষ-প্রশাসন-সরকার নির্বিকার

❖ইসরোর প্রথম মঙ্গল অভিযান
❖কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইসরো তথা নাসা
❖সাধুর 'স্বপ্নাদেশ' পেয়ে সরকারের স্বর্ণঅভিযান

বিতর্ক ■ সাক্ষাৎকার ■ বিজ্ঞানের বিশেষ খবর
সংগঠন সংবাদ ■ বিজ্ঞানের খবর

'বিজ্ঞান মনস্ক' পশ্চিমবঙ্গ'র প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল

সম্পাদকীয়

ঘূর্ণিঝড় এবং ত্রাণব্যবস্থা

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় মকরক্রান্তি রেখার দক্ষিণ ও কর্কটক্রান্তিরেখার উত্তরের বিশাল অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলি হ'ল অতিশয় ঘূর্ণিঝড় প্রবণ। এই এলাকায় যে সমস্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি অবস্থান করছে সেগুলি হ'ল ঃ অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূল, অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম উপকূল, সোলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি, ফিলিপাইনস্ দ্বীপপঞ্জ, ভারত, মায়ানমার, বাংলাদেশ, ক্যারিবিয়ন দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকোর উপসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণপূর্ব আমেরিকা, তাইওয়ান ইত্যাদি। এই সুবিস্তৃত অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলি প্রায়ই উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে শোনা যায়। উচ্চগতি সম্পন্ন ঝড়ের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে অতিবৃষ্টি, বজ্রপাত, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়। বহু মানুষের সাথে সাথে গৃহপালিত পশু, জঙ্গলের জন্তুজানোয়ার মারা যায়। গাছপালা, ক্ষেতের ফসল সহ বহু সম্পদ এই ধ্বংসলীলার হাত থেকে রেহাই পায় না। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব স্তব্ধ হয়ে যাবার পর চলতে থাকে বৃষ্টি, ফলে অতিবর্ষণের কারণে বিস্তৃর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, খাদ্যাভাব-জলাভাবে জনজীবন পর্যুদস্ত হয়। এর পিছনে পিছনে দেখা দেয় মহামারী, জলবাহিতরোগ ইত্যাদি।

পৃথিবীতে আবির্ভাব লগ্ন হতেই মানুষ অন্যান্য বিপর্যয়ের পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হয়ে আসছে। এর কার্যকারণ সম্বন্ধে কোন বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান না থাকার জন্য ও তা মোকাবিলা করার কোন দিশা না থাকার কারণে, আদিম মানুষ অসহায় ভাবে এই বিপর্যয়ের সামনে নতিস্বীকার করেছে, আত্মসমর্পন করেছে, বেবাক মারা গেছে। বিপর্যয়ের হাত থেকে কোনরকমে বেঁচে যাওয়া, স্বজন হারানো, সহায় সম্বলহীন মানুষ আবার নতুন করে জীবন যুদ্ধ শুরু করেছে। আরও একটি বিপর্যয়ের অপেক্ষায় আতঙ্কে দিন গুনেছে। বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে যেমন অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে দায়ী করেছে, অদৃষ্টকে দায়ী করেছে, দেবতাদের রূষ্ট হওয়াকে দায়ী করেছে, রূষ্ট দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য পূজাপার্বন, পশুবলি, নরবলি সংগঠিত করেছে, তেমনি বিপর্যয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায়গুলি আবিষ্কার করেছে এবং বিপর্যয়ের বস্তুনিষ্ট কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়াস রেখেছে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান তথা সমাজ বিকাশের সাথে সাথে প্রকৃতিতে ঘটে চলা সমস্ত বিপর্যয়গুলি – ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, সুনামি, দাবানল, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ইত্যাদির পিছনে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ ও প্রকৃতির নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছে ও করে চলেছে।

আগেই বলা হয়েছে পৃথিবীপৃষ্ঠে দুই ক্রান্তীয় রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলই হল ঘূর্ণিঝড় প্রবণ। এই অঞ্চলে সমুদ্রের উপরই সৃষ্টি হয় ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা কমপক্ষে ২৬°-২৭° সিলসিয়াস থাকা আবশ্যক এবং সমুদ্রের ন্যুনতম ৫০ মি. গভীরতা পর্যন্ত এই তাপমাত্রা বজায় থাকতে হবে, সঙ্গে থাকতে হবে প্রচুর জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ুমণ্ডল। উচ্চতার সাথে বায়ুর গতি ও দিকের পরিবর্তন এবং দ্রুত শীতলীকরণের ফলে নির্গত তাপশক্তি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করতে পারে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে পৃথিবীপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে গেলে তা হাল্কা হয়ে যায় ও উষ্ণ আর্দ্র বায়ু উপরে উঠে যায়। এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে শীতল বায়ু উত্তরগোলার্ধে দক্ষিণদিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রভাবে সৃষ্ট করিওলিস শক্তির কারণে সোজাসুজি প্রবাহিত না হয়ে তির্যক ভাবে অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। তাই উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে তা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে থাকে।

অঞ্চল ভেদে এই ঘূর্ণিঝড়গুলির নাম কোথাও সাইক্লোন, কোথাও টাইফুন আবার কোথাও হারিকেন। আবার ধ্বংসক্ষমতা অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় গুলিকে পাঁচটি ক্যাটাগরীতে বা স্কেলে ভাগ করা হয় এর নাম সাফির-সিম্পসন স্কেল। ক্যাটাগরী ৫ ঘূর্ণিঝড়টির ধ্বংসক্ষমতা সর্বাধিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা - মিসিসিপি উপকূলে আঘাত হানা 'ক্যাটরিনা' নামক হারিকেন এযাবৎ সর্বাধিক ব্যয়বহুল (সম্পদের ধ্বংসকারী) ঘূর্ণিঝড়। এতে প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ধ্বংস হয়। সর্বাধিক প্রাণহানির নিরিখে ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মানুষ মারা যায়। এবছর অক্টোবরের মাঝামাঝি ওড়িশা

উপকূলে আছড়ে পড়া 'ফাইলিন' নামক সাইক্লোনটি ছিল ক্যাটাগরী চার মাত্রার ঘূর্ণিঝড়। গত ৮ই নভেম্বর ঘন্টায় ৩৮০ কিমি বেগে ধেয়ে আসা সুপার টাইফুন ফিলিপিন্সে আছড়ে কমপক্ষে ১০ হাজার মানুষ, ঘর-বাড়ি, ল্যাম্প পোস্ট, অফিস, হাসপাতাল ভেঙে তছনছ করেছে। এই সুপার টাইফুনের ধ্বংসক্ষমতা প্রায় ক্যাটরিনার মত।

ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদ ধ্বংস হলেও এটাই বাস্তব যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি এবং তদ্‌জনিত কারণে বিপর্যয় এক প্রাকৃতিক ঘটনা এবং পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবহাওয়া বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক গবেষণার ফল ও তার প্রয়োগের মাধ্যমে সমুদ্রের বুকে সৃষ্ট সমস্ত ঘূর্ণিঝড়ের গতিপ্রকৃতি প্রতিটি মুহূর্তে জানা যায় খুব সহজেই। উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়টি কোথায় সৃষ্টি হচ্ছে, গতির হ্রাস বৃদ্ধি হচ্ছে কিভাবে, তার ধ্বংসক্ষমতা কত এমনকি উপকূলে আছড়ে পড়ার দিনক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যৎবানী করা সম্ভব হয়েছে। ওড়িশার গোপালপুরের কাছে গত ১১ই অক্টোবর আছড়ে পড়া ফাইলিনের আগমনবার্তা, স্থান, সময় সবই ৪৮ ঘন্টারও আগে জানা গিয়েছিল। প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে সঠিক সময় ব্যবস্থা নেওয়ায় প্রাণহানি প্রায় হয়নি বললেই চলে। অন্যদিকে ৮ই নভেম্বর ফিলিপিন্সে আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও সেখানকার প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ১০ হাজারেরও বেশী মানুষ নিহত হয়েছেন। ঘূর্ণিঝড় প্রবণ অঞ্চল হিসাবে ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রগুলিকে সাতটি বেসিন বা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও হুঁশিয়ারী প্রদানের জন্য বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার অধীনে বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া বিভাগ কাজ করছে। যেমন উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর বেসিনে তদারকী সংস্থা হল ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার। উত্তর ভারত মহাসাগর বেসিনে তদারকী করে প্যানেল দেশ সমূহ অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার ও থাইল্যাণ্ডের আবহাওয়া দপ্তর ইত্যাদি। যেহেতু পৃথিবীর আবহাওয়া, বায়ুমণ্ডল ও জলচক্রের কোন দেশীয় সীমা নাই তাই প্রতিটি অঞ্চলে অবস্থিত দেশসমূহের যৌথভাবে দায়িত্ব নেবার বিষয়টি উঠে এসেছে। দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থাগুলি যে কেবলমাত্র ঘূর্ণিঝড়ের বিষয়টি তদারকী করে তা নয়। অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন, ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি বিপর্যয়ের তাজা সমাচার পরিবেশন করে থাকে।

যাই হোক, ঘূর্ণিঝড়ের বিষয়ে গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জনের মধ্যদিয়ে আক্রান্ত দেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দেশের সরকারের কাছে বিপর্যয় মোকাবিলা করার যথার্থ দাবী তুলে ধরতে থাকে। আমেরিকা ও ইউরোপের সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষজন এই বিষয়ে সর্বপ্রথম মানুষের নিরাপত্তা, ত্রাণ, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দাবীতে সরকারের কাছে দাবী করেছে, তা আদায় করেছে এবং এটিকে সাধারণমানুষের অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সচেতনতা ক্রমশঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে তা খুবই স্বাভাবিক। ১৬ই জুন ২০১৩ উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে মেঘভাঙ্গাবৃষ্টির পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে আগাম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছে যা ঠেকানো সম্ভব ছিল। এই ঘটনায় দেশব্যাপী সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। তবে অক্টোবর, ২০১৩ তে অন্ধ্র - ওড়িশা উপকূলে 'ফাইলিন' আছড়ে পড়ার আগে ৫০০ টি ত্রাণশিবিরে ৫ লক্ষাধিক উপকূলবর্তী মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে ও প্রাণরক্ষা করেছে। এই ঘটনায়, বিজ্ঞানকে সাধারণের স্বার্থে ব্যবহার করে মানুষের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব এই চেতনা যেমন মানুষের মনে সঞ্চালিত হয়েছে তেমনই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা যে সাধারণ মানুষের কাজ নয় বরং এটা রাষ্ট্রেরই দায় এই চেতনার স্তরে উন্নীত হচ্ছে ক্রমশঃ।

সম্প্রতি কিছু আবহাওয়া বিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছেন যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন বা ক্রান্তীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। ১৯২৩ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ৯০ বছরের হিসাব দেখিয়ে তারা এর গড় সংখ্যাবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। এত অল্প সময়ের তথ্যের ভিত্তিতে যদিও স্থির সিদ্ধান্ত টানা যায় না তথাপি প্রশ্ন ওঠে যে এর কারণ কী? চীনা ও বৃটিশ বিজ্ঞানীরা চালু তত্ত্ব হিসাবে ভূ-উষ্ণায়নকে এর জন্য দায়ী করেছেন বটে তবে ১৯৪০ এবং ১৯৭০-এর দশকে ভূ-শীতলায়ন সত্ত্বেও এটা হল কেন তা বলতে পারেন নি। বিজ্ঞানীদের একটা অংশ সমুদ্রে পারমাণবিক বর্জ্য ক্রমবর্ধমান হারে নিক্ষেপ করাকে এর জন্য দায়ী করেছেন। এর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া না গেলেও তথ্য ও প্রমাণ প্রয়োজন স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে।

যাইহোক, বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ ক্রমশঃ বুঝতে পারছেন কেবলমাত্র বিপর্যয় ঘটার পূর্বে নয়, বিপর্যয়ের পরবর্তী সময়েও বিপন্ন মানুষজন যাতে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন, সেই ব্যাপারে সমস্তরকম সাহায্য, সহযোগিতা, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই অধিকারবোধ সাধারণের মনে জাগানোর উদ্দেশ্যে সমস্ত বিজ্ঞান মনস্ক মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। ■

ইসরোর প্রথম মঙ্গল অভিযান

মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে পরিভ্রমণ অভিযানে (মার্স অরবাইটার মিশন) প্রেরিত মঙ্গলযানকে প্রথমে পৃথিবীর কক্ষপথের উদ্দেশ্যে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে গত ৫ই নভেম্বর ২০১৩। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংগঠন (ইণ্ডিয়ান স্পেস রিযার্চ অর্গানাইজেশন) চেন্নাই শহরের নিকটবর্তী অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটা লঞ্চ প্যাড থেকে দুপুর ২টা ৩৮ মিনিটে এই মহাকাশযান পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল(পি এস এল ভি) উৎক্ষেপণ করে।

এই মার্স অরবাইটার মিশন প্রায় একমাস পৃথিবীর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করবে এবং ধাপে ধাপে পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে অধিক উচ্চতায় (২৪৬ কি.মি থেকে ২৩,৫৬৬ কি.মি) উঠতে থাকবে। এইভাবে ৬ বার উচ্চ থেকে উচ্চতর কক্ষপথে যাওয়ার পর আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে হেলিওসেন্ট্রিক মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে প্রবেশ করার কথা। ১লা ডিসেম্বর ছোট ছোট ৬টি রকেটের সাহায্যে নিক্ষেপ করা হবে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথের উদ্দেশ্যে। যন্ত্রটি মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছে যাওয়ার কথা ২০১৪-এর ২১-২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যে। পৌঁছানোর পর ৩৭৭×৮০,০০০ কিমি (প্রতি ঘন্টায়) গতিবেগে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে মঙ্গলগ্রহকে সে পাক খাবে ৩.১৬ দিনে।

এই মঙ্গলযান নামক কৃত্রিম উপগ্রহটির ভর ১৫ কেজি। এতে আছে – ১) লাইম্যান আলফা ফটো মিটার যা মঙ্গল গ্রহে ডয়েটোরিয়াম এবং হাইড্রোজেনের অন্য আইসোটোপের অনুপাত বার করে একসময় মঙ্গলে জল ছিল কিনা তা বোঝার চেষ্টা করবে। ২) মার্স এক্সোস্ফেরিক নিউট্রাল কম্পোজিশন অ্যানালাইজার যা মঙ্গলকে বায়ুমন্ডলে যে ধরনের অণু আছে তার ছবি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য দেবে। ৩) মিথেন পরিমাপক যন্ত্র যা থেকে সেখানে (এখনও বা অতীতে) প্রাণ ছিল কিনা বুঝতে সাহায্য করবে। ৪) মার্স কালার ক্যামেরা যা মঙ্গলপৃষ্ঠ এবং তার দুই উপগ্রহের ছবি তুলবে, সেখানকার আবহাওয়া এর সাহায্যে জানা যাবে। ৫) থার্মাল ইনফ্রারেড ইমেজিং স্পেকট্রোমিটার – যা মঙ্গলগর্ভে খনিজ সম্পদ সন্ধান করবে।

এই মিশন সফল হলে ইসরো হবে চতুর্থ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা যারা মঙ্গল অভিযানে সফল। অতীতে সোভিয়েত মহাকাশ কর্মসূচী, নাসা এবং ইউরোপীয় মহাকাশ এজেন্সী এই অভিযানে সফল হয়েছিল। চীন ও জাপানের মঙ্গল অভিযান সফল হয়নি।

নাসার ডীপ স্পেস নেটওয়ার্ক (ডি এস এন) ভারতের মার্স অরবাইটার মিশনকে প্রথম থেকেই সাহায্য করে আসছে। গত ২৪ শে জুন ভারত-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী প্রতিনিধিরা জানান যে ভারতের মঙ্গল পরিভ্রমণ অভিযান (মার্স অরবাইটার মিশন) কে সফল করতে উভয় দেশের বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে কাজ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র সচিব জন কেরী বলেন "নাসা এই মিশনকে ডিপ স্পেস নেভিগেশন এবং ট্রেকিং সাপোর্ট সার্ভিস দিচ্ছে"।

মার্স অরবাইটার মিশন এর পরিকল্পনা হয় ২০১০ সালে। চাঁদের কক্ষপথে সফলভাবে প্রেরিত চন্দ্রযান-১ অভিযান ২০০৮ এর পর। ভারত সরকার প্রকল্পটি অনুমোদন করে ৩রা অগাস্ট ২০১২। কক্ষপথে ভ্রমণের জন্য ১২৫ কোটি টাকা এবং সমগ্র প্রকল্পের জন্য ৪৫৪ কোটি টাকার প্রয়োজন বলে ইসরো জানিয়েছে। এরমধ্যে উপগ্রহটির জন্য ১৫৩ কোটি এবং গ্রাউন্ড স্টেশন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে খরচ হবে বাকী টাকা। ইসরো প্রথমে পরিকল্পনা করেছিল যে ২৮ শে অক্টোবর অভিযান শুরু হবে কিন্তু এই মহাকাশযানটিকে নজরদারির জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে যে জাহাজগুলি কাজ করবে, সমুদ্রে খারাপ আবহাওয়ার জন্য সেই অংশের বিজ্ঞানীদের থেকে অভিযান পিছিয়ে দিতে বলায় উৎক্ষেপণের দিন পেছোনো হয়।

মঙ্গলের কক্ষপথে এই মার্স অরবাইটারটির জীবনকাল মাত্র ৬ মাস থেকে ১০ মাস এবং "মঙ্গলযান" কখনওই মঙ্গলের মাটি ছোঁবে না।

৬টি উচ্চ থেকে উচ্চতর কক্ষপথে যাওয়ার পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হবে স্পেসবোর্ড কন্ট্রোল সেন্টার (এস সি সি) ইসরো, বেঙ্গালুরু থেকে ৬,৭,৮,১০,১১ এবং ১৬ই নভেম্বর এবং ১লা ডিসেম্বর পৃথিবীর অভিকর্ষ পার করার জন্য রকেট

১১.২ কি.মি প্রতি সেকেণ্ড গতিবেগে পৌঁছাবে।

প্রশ্ন উঠেছে যে মঙ্গলের আবহাওয়া, সেখানে মিথেন ও জলের উপস্থিতি, খনিজ সম্পদ এবং উপগ্রহগুলির চরিত্র তো মঙ্গলপৃষ্ঠে নাসা'র পাঠানো কিউরিওসিটির মারফতই জানা সম্ভব। ইসরোর মঙ্গল অভিযান তো প্রথম থেকেই নাসার সহযোগিতা ও নেতৃত্বে পরিচালিত, তবে এর পৃথক উদ্দেশ্য কী? এর উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং ইসরোর চেয়ারম্যান কে রাধাকৃষ্ণণ। তিনি বলেছেন "উদ্দেশ্য হল ভারতের প্রযুক্তির উন্নতির প্রদর্শন। একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে মঙ্গলের কক্ষপথে পাঠানো কঠিন কাজ।"

আমাদের একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে মার্কিন নাসার মত ভারতের ইসরোও দেশের প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীন। শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের জন্য নয় সামরিক কাজেও এই সংস্থাগুলি ব্যবহৃত হয়। অতীতে ইসরো তৈরী করেছিল পরমাণু অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র, এখনও তা তৈরী অব্যাহত আছে। ইসরো বা ডিআরডিও দ্বারা নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র, রকেট, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদির বাজার সৃষ্টির জন্যও এসব পরীক্ষা করে প্রদর্শন করা প্রয়োজন। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইসরো তথা নাসা

ইসরো (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন – ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংগঠন); নাসা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস অ্যাডিমিনিস্ট্রেশন – জাতীয় মহাকাশ যান ও মহাকাশ সম্বন্ধীয় প্রশাসন)।

উপরিউক্ত দুটি সংস্থায় নিয়োজিত বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও কর্মীদের প্রায় সকলেই অলৌকিকবাদ-কুসংস্কারবাদে আচ্ছন্ন; এই সত্যটা ইসরো'র মঙ্গলায়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আবারও প্রকট হয়েছে।

খবরেই প্রকাশ যে ইসরো নির্মিত কৃত্রিম উপগ্রহটি সহ মঙ্গলাযান উৎক্ষেপণ করার দিন-ক্ষণ ঠিক করা হয়েছিল হিন্দু পঞ্জিকায় বর্ণিত শুভ দিন-লগ্ন অনুসারে। এছাড়া উৎক্ষেপণের আগে মঙ্গল অভিযান সফল করার প্রার্থনায় ইসরো'র প্রধান কর্মকর্তা কে. রাধাকৃষ্ণাণ সপার্ষদ তিরুপতি মন্দিরে পূজা দিয়েছেন নৈবেদ্য সাজিয়ে – নৈবেদ্যর ডালিতে ছিল মঙ্গল গ্রহকে প্রদক্ষিণের জন্য নির্মিত উপগ্রহটির অতি ক্ষুদ্র একটি মডেল। খ্রিস্টানরা ১৩ সংখ্যাটিকে অশুভ মনে করে বলে ইসরো তার ১২ নম্বর অভিযানের পরবর্তী নম্বর ১৩ না দিয়ে দিয়েছিল ১৪।

মার্কিন সংস্থা নাসা'র জেট প্রপালসান ল্যাবরেটরি'র কর্মীরা ইসরো'র বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে এক বার্তায় (৩১শে অক্টোবর ফেসবুকে পোস্টিং) মঙ্গলযানটি উৎক্ষেপণের আগে নিজেদের মধ্যে চিনাবাদাম বিতরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কেননা, তাদের অভিজ্ঞতা হল চিনা বাদাম বিতরণ করলে সফল হওয়া যায়। তাদের প্রথম চন্দ্র অভিযানের (১৯৬১ খ্রি.) সময় থেকেই তারা নিজেদের মধ্যে চিনাবাদাম বিতরণ করে আসছেন প্রতিটি অভিযানের সময়। (দ্র. হিন্দুস্তান টাইমস ২.১১.২০১৩)

কুসংস্কারবাদে ইসরো'র আচ্ছন্নতাকে সমালোচনার করে বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা ইংরেজী দৈনিক স্টেটসম্যান-এর প্রিন্ট জার্নালিজম স্কুলের প্রাক্তন ডিরেক্টর সাম রাজাপ্পা লিখেছেন ঃ

"ইসরোর মতো একটি বৈজ্ঞানিক সংগঠনের অন্ধ বিশ্বাসের কোনও স্থান থাকা উচিত নয়। সংবিধানের ৫১-এ ধারাতে বলা আছে 'ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হলো বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবাদ বিকশিত করা ও অনুসন্ধিৎসু ও সংস্কারমুখী হওয়া।' এখন দেখা যাচ্ছে ভারত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের জগতে পতিত হচ্ছে। অক্সফোর্ড ডিকশনারি কুসংস্কারের বর্ণনা করেছে এই ভাবে 'প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ব্যখ্যা করা যায় না এমন শক্তির বা এমন কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস; অজ্ঞাত বা রহস্যময় কিছুর অযৌক্তিক ভীতি।' এমনকি, সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রর নতুন মিডিয়া কেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছে বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে। মঙ্গলযানটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে কেরালা'র জ্যোতিষীদের পরামর্শ মতো ৫ই নভেম্বরের **রাহুকাল, গুলিকাকাল ও থামকাদফকাল** বাদ

দিয়ে বেলা ২টা ১৮ মিনিটে। ইসরোর জন্য আকাশমুখী জানালা খোলা হয় শুভ দিন ও লগ্ন অনুসারে। ইসরো'র কোন বড় অভিযানের আগে রাধাকৃষ্ণাণ নাকি ত্রিসূরের কোন একটি মন্দিরে যান যেখানে যাদু-টোনা ও ভূত-প্রেতের পূজা হয়। অবশ্য ওখানে যাওয়ার তাঁর ব্যক্তিগত সাংবিধানিক অধিকার আছে। ইসরো'র চেয়ারম্যান [রাধাকৃষ্ণাণ] ও তাঁর টীমের বিজ্ঞানীরা তিরুপতিতে অবস্থিত প্রভু ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে, নিকটস্থ কালাহস্তি মন্দিরে এবং আলারপেট আন্নামালাই মন্দিরে মহাকাশ যানের মডেল নিবেদন করে পূজা না দেওয়া পর্যন্ত শ্রীহরিকোটা'র সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে কোন অভিযানই (উৎক্ষেপণই) হয় না। কুসংস্কারবাদ তাঁদের ঘাড়ে চেপে থাকে তাই ১৩ সংখ্যাটিকে তাঁরা ভয় করেন। পি এস এল ভি - ১২'র সফল উৎক্ষেপণের পরবর্তী উৎক্ষেপণটির সংখ্যা ১৩ না দিয়ে দিয়েছিলেন ১৪। কুসংস্কার কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা উৎপত্তি করে কেননা কুসংস্কার চিন্তা করার অনুমতি দেয় না, দাবি করে অন্ধ বিশ্বাস। ইসরো-কে যদি মহাকাশ সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করতে হয় ও এগিয়ে যেতে হয় তবে নিরর্থক রহস্যময়তার ও যাদু-টোনার শিকার না হয়ে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে, অন্তত সিনিয়রদের মধ্যে।" (দ্র. স্টেটসম্যান, ১০.১১.২০১৩)

ইসরো'র সংস্কারবাদী ভূমিকার সমালোচনা করে সাম রাজাপ্পা বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন।

আদিম অলৌকিকবাদের তমসা থেকে প্রাকৃতিক ও জৈবনিক সত্যকে মুক্ত করার জ্ঞান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের। মহাকাশে বিচরণশীল গ্রহ-নক্ষত্ররাজি তথা অসংখ্য সৌরজগতের আবিষ্কার, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বর পরিমাপক (আলোর গতি ভিত্তিক) আলোকবর্ষ ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলেই মানুষের মহাকাশ অভিযান সফল হচ্ছে। এই সত্যটাকে স্বীকার করেও যাঁরা জ্ঞানান্ধর মতো আদিমকালের অলৌকিকবাদেই আস্থাশীল, ভাগ্য লিপিতে আস্থাশীল তাদের বিজ্ঞানী বলা যায় না, প্রযুক্তিবিদও বলা যায় না।

যে কোনও বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলে, এমনকী আকাশ বাণী, বিবিসি সহ যে কোনও বেতার কেন্দ্র'র বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার আসরে প্রশ্নোত্তর পর্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে উত্তরে বলা হয় "বিজ্ঞান ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।" অন্যদিকে যেকোনও বেতার কেন্দ্রর অন্যান্য আসরে ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিত্তিক তথা বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাস ভিত্তিক প্রচার করা হয়।

বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থাগুলি ব্যবসার প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আয়োজন করলেও, রাষ্ট্রের সংবিধানে বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার আবশ্যকতাকে তুলে ধরলেও কাজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করে কুসংস্কারবাদকেই আশ্রয় করে ও প্রশ্রয় দেয়। সংখ্যাধিক মানুষকে বিশেষত শোষিত শ্রমজীবী জনতাকে অজ্ঞানতার তিমিরে ডুবিয়ে রেখে শোষণ করার অন্যতম মুখ্য উপায় হলো সংস্কারবাদ। তাই প্রায় সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় গান বা জাতীয় গান হয় ঈশ্বর বন্দনার। রাষ্ট্রীয় গান অলৌকিকবাদ কুসংস্কারবাদকে টিকিয়ে রাখার সহায়ক।

বিজ্ঞান ঈশ্বরে প্রতি বিশ্বাসকে অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার বললেও বিজ্ঞানীদের সুবিপুল অংশ ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিন্তু এই বিশ্বাসকে সাধারণ্যে প্রচার করে তাঁরা বিজ্ঞানের অবমাননা করেন, যার দ্বারা তাঁরা নিজেদেরও বিজ্ঞানের প্রতি অবিশ্বস্ত প্রমাণ করেন এবং জনসাধারণকে অবিশ্বস্ত হতে প্ররোচিত করেন। এঁদের মধ্যে কেউ বা সামন্ত বুর্জোয়া ভাবধারায় নিষিক্ত হওয়ার কারণে, কেউ বা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আনুকূল্য খোয়াবার ভয়ে অথবা তাঁদের স্পনসর বা মালিক কোম্পানির প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে অলৌকিকবাদের ফেরি করেন।

বিজ্ঞানের প্রায়োগিক সফলতার কারণে জনসাধারণের মধ্যে অলৌকিকবাদের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার ফলে বুর্জোয়া রাষ্ট্র তথা ধর্মের ব্যাপারীরা সামন্ত বুর্জোয়া ভাবধারায় নিষিক্ত "বিজ্ঞানীদের" দিয়ে প্রচার করায় যে বিজ্ঞানীরা অলৌকিকবাদ অস্বীকার করেন না। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর তাঁরা তাঁকে ঈশ্বরবাদী হিসাবে প্রচার করা শুরু করেছে। মহাকাশে মহা বিস্ফোরণ (বিগ ব্যাং) বিশ্ব-মহাবিশ্ব সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব'র আলোকে গবেষণালব্ধ মহাকাশে বিচরণশীল অগণিত কণাগুলির ভর প্রদানকারী হিগস-বোসন তাত্ত্বিক কণা সম্বন্ধীয় পুস্তকের নাম "ঈশ্বরকণা" (গড পার্টিক্‌ল) রাখার জন্য লেখককে বাধ্য করেছিল পুস্তকটির প্রকাশক, যা লেখক স্বীকার করেছেন। তাই হিগস-বোসন কণাটির অস্তিত্ব সার্নের প্রায়োগিক গবেষণায় প্রমাণসিদ্ধ হওয়ার পর বুর্জোয়ারা "ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত" বলে যে উল্লাসে মেতে উঠেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণের মধ্যে অলৌকিকবাদের প্রতি আস্থা রাখার জন্য যাদের মধ্যে অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য এই আবিষ্কারকে ব্যবহার করা।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কি ঈশ্বরবাদ-ধর্মবাদে আস্থাশীল

ছিলেন? আদৌ না। এর প্রমাণ তাঁর নিজের লেখা একটি চিঠি এবং নিজের লেখা আত্মজীবনী। তিনি ঈশ্বরবাদ-ধর্মবাদকে বলেছিলেন অত্যন্ত শিশু সুলভ কুসংস্কার ('most childish superstition')

"ধর্ম অত্যন্ত শিশু সুলভ কুসংস্কার"

– আইনস্টাইন

মৃত্যুর একবছর আগে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে, দার্শনিক এরিক গুট কাইন্ড (Erik Gutkind), রচিত পুস্তক ('Choose Life : The Biblical Call to Revolt'), পড়ে উক্ত দার্শনিককে আইনস্টাইন লিখেছিলেন ঃ

"... ঈশ্বর শব্দটি আমার কাছে মানুষের দুর্বলতার উৎপাদন ও অভিব্যক্তি (product and expression); সম্মানীয়দের সংগ্রহ হলো বাইবেল, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ আদিম কল্প-কাহিনী, এই সব কারণে নিতান্তই **শিশু সুলভ** বা pretty childish। কোন ব্যাখ্যাই, তার প্রসার যাই হোক না কেন, যতই গুণের হোক না কেন তাতে আমার মতের কোনও পরিবর্তন হবে না। আমার মতে ইহুদী ধর্ম অন্যান্য ধর্মের মতোই **অত্যন্ত শিশুসুলভ কুসংস্কারের** অবয়ব। ইহুদীদের, আমিও তাঁদের মধ্যকার একজন, তাঁদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক আছে, অন্যান্য সমস্ত লোকদের সঙ্গে পার্থক্যকারী গুণসম্পন্ন বলে আমি মনে করি না। আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাঁরা মানবজাতির অন্যান্য গ্রুপগুলির থেকে উন্নততর নয়, যদিও তাঁরা ক্ষমতার অভাবে, তাদের ধ্বংসের হাত থেকে সুরক্ষিত (protected)। এছাড়া তাদের মধ্যে 'পার্থক্য সূচক' কিছু দেখছি না। ..." [জোর আইনস্টাইনের; উদ্ধৃতিটি প্রো. বসন্ত নটরাজন লিখিত নিবন্ধ 'Childish Superstition' থেকে নেওয়া।]

৬৭ বছর বয়সে জার্মান ভাষায় আত্মজীবনীতে আইনস্টাইন লিখেছেন ঃ

"... ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন [বা বিরূপ] (irriligious) পিতা-মাতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও এইভাবে আমি ধর্মমতে গভীরভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম, অবশ্য ১২ বছর বয়সেই হঠাৎ তার সমাপ্তি ঘটেছিল। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বইগুলি পড়ে আমার এই বিশ্বাস জন্মাল যে বাইবেলের কাহিনীগুলি সত্য হতে পারে না। এর নিশ্চিত ফল ছিল যুগপৎ অত্যুগ্র মুক্ত চিন্তার উদ্ভব এবং এই ধারণার উদ্ভব যে রাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যার মাধ্যমে প্রতারিত করে যুবককে (youth is intentionally being deceived by the state through lies), এটা ছিল [মিথ্যাকে] পরাস্ত করার শক্তিধর ধারণা (crushing impression)। এই অভিজ্ঞতা থেকে সমস্ত ধরনের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সন্দেহ উৎপন্ন হয়েছিল, যে কোন সামাজিক পরিবেশে বিদ্যমান বিশ্বাসের প্রতি সন্দেহ পোষণ করার মনোভাবের উৎপত্তি হয়েছিল, এই মনোভাব কখনও লুপ্ত হয়নি। এমনকি পরবর্তীকালে যখন, সাময়িক সম্পর্কগুলির প্রতি উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির কারণে খেদ উদ্রেকতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল তখনও লুপ্ত হয়নি।

"এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল যে, এইভাবে হারান কৈশোরাবস্থার ধর্মীয় স্বর্গরাজ্যটা ছিল 'নিতান্তই ব্যক্তিগত' বন্ধন থেকে মুক্তির, ইচ্ছা, আশা ও **আদিম অনুভূতির** দ্বারা প্রভাবিত অবস্থা থেকে মুক্তির প্রথম প্রয়াস। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের থেকে, মানুষের থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিরদুর্বোধ্যের মতো বিরাট এই বিশ্ব, যা অংশত পর্যবেক্ষণ যোগ্য ও চিন্তায় প্রতিফলিত। এই বিশ্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার উৎসাহ যেন মুক্তির দুয়ার খুলে দিয়েছিল। **আমি সহসাই লক্ষ করলাম যে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের আমি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করতে শিখেছিলাম, যাঁরা তাদের নিজেদের প্রিয় কাজে অন্তরস্থ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা দেখতে পেয়েছিলেন এবং তা নিয়েই কাজে নিয়োজিত ছিলেন।** নির্দিষ্ট সম্ভাবনাগুলির পরিকাঠামোর মধ্যকার ব্যক্তি সম্পর্ক বহির্ভূত এই বিশ্ব সম্বন্ধে মানসিক উপলব্ধি আমার মনশ্চক্ষুতে কিছুটা চেতনভাবে, কিছুটা অচেতনভাবে সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার মতো সাঁতরাতে লাগল। **একইভাবে অনুপ্রাণিত অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্ত অতীতের ও বর্তমানের মানুষরা হলেন বন্ধু, যে বন্ধুত্ব হারান যায় না। এই স্বর্গরাজ্যের দিকের রাস্তাটি ধর্মীয় স্বর্গরাজ্যের দিকের রাস্তার মতো প্রলুব্ধকারী ও আরামদায়ক নয়। এই রাস্তাটা কিন্তু নিজেকে দৃঢ় প্রত্যয়শীল প্রমাণ করেছে। এই রাস্তা বেছে নেওয়ার জন্যে আমি কখনই দুঃখ প্রকাশ করিনি।"**

[জোর আইনস্টাইনের; উদ্ধৃতিটি প্রো. বসন্ত নটরাজনের উপরিউক্ত নিবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। তাঁর ইমেল : *profvasant@gmail.com* – দ্র. হিন্দু ৩০.১০.২০১৩]

২০১৩ সালের বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

২০১৩ সালে পদার্থ বিদ্যায় বেলজিয়ামের**ফ্রান্সিস ইঙ্গলার্ট** এবং ব্রিটেনের **পিটার হিগস**কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে পদার্থ নিয়ে গঠিত, তারা যে পরমাণু দ্বারা গঠিত সেগুলিও অসংখ্য সাব অ্যাটমিক কণা দ্বারা গঠিত। এই সাব অ্যাটমিক কণাগুলির কেউ কেউ শুধুমাত্র ভর বহন করে অর্থাৎ তাদের আদান-প্রদানের মাধ্যমে কোন কণায় শক্তি সঞ্চারিত হয়। পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন কণাগুলির মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কই হল স্ট্যান্ডার্ড মডেল। এই স্ট্যান্ডার্ড মডেলের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল একটি বিশেষ কণা যা পদার্থকে ভর দান করে। এই কণা পদার্থকে ভর দান ক'রে ক্ষণিকের জন্য স্থায়ী হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভর অর্জনের জন্য এই বিশেষ কণাটিই দায়ী। এই তত্ত্বটি ১৯৬৪ সালে প্রথম উন্মোচন করেন পিটার হিগস্। হিগস্ এর নাম অনুসারে এই কণাটির নাম হয় হিগস পার্টিকল। এর সপ্তাহ খানেক পর ফ্রান্সিস ইঙ্গলার্ট স্বাধীনভাবে একই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউট (যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন) এর সাথে। ২০১২ সালের ৪ঠা জুলাই সার্ন এর পরীক্ষাগারে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার যন্ত্রের (সিএমএস এবং অ্যাটলাস) সাহায্যে এই যুগান্তকারী তত্ত্ব প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞানী জেরাল্ড গুরালনিক, টম কিবল এবং কান্ট হেগেল এর মত বিজ্ঞানীদেরও এই তত্ত্বগত গবেষণায় ভূমিকা আছে।

এই গবেষণার জন্য শুধুমাত্র পিটার হিগস্ এবং ফ্রান্সিস ইঙ্গলাটকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানী মহলে বিতর্ক হয়েছে। যাদের নিরলস গবেষণার জন্য এই তত্ত্ব প্রমাণিত হল সেই সার্ন কেন নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হল তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এবছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ৩ জন মার্কিন বিজ্ঞানী যাঁরা জন্মসূত্রে কেউই মার্কিনী নন। অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহনকারী **মার্টিন কারপ্লাস**, দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী **মাইকেল লেভিট** এবং ইজরায়েলে জন্মগ্রহণকারী **আরিয়াও ওয়ারশেল** এবার রসায়নে নোবেল পেলেন।

প্রতিটি রাসায়নিক বিক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হয় (মিলি সেকেন্ডের ভগ্নাংশের সময়ে) যখন একটি পরমাণুর ইলেক্ট্রন অন্য আরেকটি পরমাণুর উপর লাফিয়ে পড়ে রাসায়নিক বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। এত দ্রুত সংগঠিত হওয়া রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ধ্রুপদী রসায়ন দ্বারা সম্পূর্নভাবে ও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছিল না। তুলনামূলক সহজতর ধ্রুপদী নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার দ্বারা বড় অণুগুলির মডেল বানানো সহজ হলেও রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল না। আবার কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে পরমাণু বা আরও ক্ষুদ্রতর থেকে ক্ষুদ্রতম কণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হলেও গণনার জটিলতা এবং সহজভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অণুগুলির মডেল তৈরী এতদিন সম্ভব হয়নি।

কারপ্লাস, লেভিট এবং ওয়ারশেলই প্রথম ধ্রুপদী এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যাকে একই সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া বিশ্লেষণে প্রয়োগ করেন। সর্বোপরি কম্পিউটারের মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে কোয়ান্টাম পদার্থ বিদ্যার মাধ্যমে বিশ্লেষণ এবং ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার দ্বারা মডেল তৈরীর বিষয়টি রসায়ন বিদ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করেছে। সবুজ পাতায় সালোক সংশ্লেষ থেকে বিক্রিয়ার অনুঘটকের শুদ্ধিকরণের মতো বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে সঠিক পূর্বানুমান করার ক্ষেত্রে ধ্রুপদি ও কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা প্রয়োগের দ্বারা এবং জটিল কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে তা তুলে ধরার জন্য কারপ্লাস, লেভিট এবং ওয়ারশেলকে এবছর সুইস অ্যাকাডেমি নোবেল পুরস্কার দিয়েছে।

এই গবেষণার ফলে কোন ওষুধ কিভাবে তার লক্ষ্যবস্তু প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয় তার বিস্তারিত ও পুঙ্খনাপুঙ্খ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি কম্পিউটারকে একটি টেস্ট টিউবের মতই সমানভাবে ব্যবহার করা ও তার মাধ্যমে বিক্রিয়ার ফলকে সফলভাবে অনুমান করা সম্ভব হবে।

এবছর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন মার্কিন বিজ্ঞানী **জেমস্ রথম্যান**, **র‍্যান্ডি শেপম্যান** এবং জার্মানীতে জন্মগ্রহণকারী এবং বর্তমানে মার্কিন নাগরিক **থমাস সুদোভ**। কোষের পরিবহন সংক্রান্ত 'ভেসিকল ট্রাফিক'-এর কার্যপ্রণালী আবিষ্কারের জন্য এই তিন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

একটি কোষের মধ্যে পদার্থের পরিবহন কিভাবে হয় তা এতদিন জানা ছিল না। এই তিন বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে কোষের পরিবহন মূলতঃ পরিচালিত হয় ছোট ছোট লিপিড (ফ্যাট) কণা 'ভেসিকল' দ্বারা। একটি সহজ উদাহরণ দ্বারা

ভেসিকলের প্রণালী বোঝা যায় – কোনও কোষে যখন ইনসুলিন তৈরী হয় এবং তা রক্তে মিশ্রিত হয় তখন বার্তাবহনকারী অনু, যাদেরকে নিউরো ট্রান্সমিটার বলা হয়, তারা এই বার্তা এক কোষ থেকে অন্য কোষে প্রেরণ করে আর এই প্রেরণের কাজ সম্ভব হয় ছোট্ট ছোট্ট লিপিড কণা ভেসিকল দ্বারা।

ভেসিকল দ্বারা কোষের পরিবহনের পেছনে তিন শ্রেণীর বিশেষ ধরনের জীনের ভূমিকা আবিষ্কার করেন র‍্যান্ডি শেকম্যান। একটি ঈস্ট কোষের ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে তিনি এই তিন শ্রেণীর জিনের উপস্থিতি ও ভূমিকা লক্ষ্য করেন। ■

সাধুর 'স্বপ্নাদেশ' পেয়ে সরকারের স্বর্ণঅভিযান

সাধু শোভন সরকার ওরফে ভাস্কর আনন্দ দেব কানপুর দেহাত জেলার শোভন আশ্রমের সাধু। তিনি গত সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ দাবী করেন যে ইংরেজ সরকারের হাতে ১৮৬১ সালে শহীদ হওয়া রাজা রামরাও বক্স তাঁকে নাকি স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানিয়েছেন যে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের উন্নাও জেলার ডান্ডিয়া খেরা মন্দিরের পাশে কেল্লার নীচে ১০০০ টন সোনা পোঁতা আছে! রাজা নাকি সাধুকে ওই সোনা উদ্ধার করে দেশের কাজে খরচ করতে আদেশ করেছেন!

সম্প্রতি স্বর্ণঅভিযানের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠা উন্নাও উত্তরপ্রদেশের ৭১টি জেলার মধ্যে একটি জেলা। কানপুর শহরের নিকটবর্তী এই জেলা অতীতে রায়বেরিলির সাথে যুক্ত ছিল। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বর্তমান উন্নাও জেলার অধিকাংশ জমিদার এবং তালুকদাররা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া বিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন। ডান্ডিয়া খেরা গ্রামের রাজা রামবক্স ছিলেন তেমনই একজন। সম্প্রতি যে মন্দিরকে ঘিরে স্বর্ণঅভিযান হল সেইখানে, সেই সময় সঙ্গীর বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে যান তিনি। বিদ্রোহ দমনের পর উন্নাও-এর এক বটগাছে ঝুলিয়ে তাঁকে ফাঁসি দেয় ইংরেজ সরকার ১৮৬১ সালে।

সেই সময় থেকে এই শহীদ উন্নাও তথা আশপাশ অঞ্চলের মানুষের কাছে অত্যন্ত সম্মানের মানুষ। আজও তাঁকে নিয়ে রচিত নানা লোকগাথা ঘোরে মানুষের মুখে মুখে।

মানুষের মনে কুসংস্কারের বীজ বুনে দেশব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠতে অতীতের জনপ্রিয় শহীদ রাজাকে তাই কৌশলে ব্যবহার করেছেন এই ধূর্ত-সাধু। প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বেছে নেন তাঁরই অন্যতম ভক্ত তথা শিষ্য কেন্দ্রীয় কৃষি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী চরণদাস মোহান্তকে। অতঃপর মন্ত্রীমশাই মন্ত্রীর দপ্তর থেকেই ওই স্বপ্নাদেশ তথা গুপ্তধনের কথা জানিয়ে ২৯শে সেপ্টেম্বর ই-মেইল করেন জিওলজিক্যাল সার্ভে-অফ ইণ্ডিয়া (জি এস আই)-র ডাইরেক্টর জেনারেলকে। মন্ত্রীর হুকুম শুনে বাধ্য হয়ে জি এস আই একটা ছোট টিম নিয়ে ৩রা এবং ৪ঠা অক্টোবর কেল্লার কাছাকাছি গিয়ে জিওফিসিক্যাল সার্ভে করে। 'সার্ভে'-র পর জি এস আই জানায় যে "ভূগর্ভে সোনা আছে কি না বলা যাচ্ছে না, তবে কিছু অচৌম্বকীয় ধাতু থাকলেও থাকতে পারে"। জি এস আই কৃত এই সমীক্ষা রিপোর্টে নির্দিষ্টভাবেই উল্লেখ আছে যে স্বপ্নাদেশের ভিত্তিতে মন্ত্রীর মেল পেয়েই এই সমীক্ষা করা হয়েছে। জি এস আই এর কাছ থেকে 'সবুজসংকেত' পেয়ে গত ১৮ই অক্টোবর থেকে স্বপ্নের স্বর্ণ অভিযান শুরু করে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া (এ এস আই) বা ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।

এই খবরে ধর্মভীরু তথা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের উৎসাহ বেড়ে যায় হাজারগুণ। দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসতে থাকেন। অঞ্চলে স্থায়ী মেলা বসে যায়। খবরের কাগজ এবং টেলিমিডিয়ার প্রচার এই উৎসাহকে শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। ২৪ ঘন্টা ধরে নানা চ্যানেলে খননকাজের লাইভ টেলিকাস্ট চলতে থাকে।

এই উৎসাহে এবং সরকারী বদান্যতায় উচ্ছসিত সাধু আরও গল্প শোনাতে শুরু করেন। মিডিয়াকে তিনি জানান যে উত্তরপ্রদেশের ফতেপুরের শিবমন্দিরের তলাতেও নাকি ২৫০০ টন সোনা পোঁতা আছে। গল্প শুনে সুযোগ সন্ধানীরা এ এস আই এর তোয়াক্কা না করে নিজেরাই মন্দিরের দুই পুরোহিতকে মারধোর করে মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করে। এর ফলে দুর্ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়।

এদিকে এ এস আই-এর খনন কাজ চলতে থাকার সময় কিছুই না মেলায় সাংবাদিকরা এ এস আই কর্তাদের প্রশ্ন করেন খননকাজ চলছে কোন কারণে। বিপদে পড়ে এ এস আই কর্তারা বলতে শুরু করেন যে সোনা উদ্ধারের জন্য নয়, ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিস্কারের জন্যই খনন কাজ হচ্ছে।

তাঁরই দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে 'স্বপ্নাদেশের ভিত্তিতে' সরকারের এই খননকাজ হওয়ায় বিপদে পড়ে এই কাজের সমালোচনা করেন ইউপিএ জোটের অন্য শরীক কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার। এছাড়া সমালোচনার সুযোগ পেয়ে সরকারকে নিন্দা করেন জে ডি ইউ নেতা শরদ যাদব এবং কয়েকটি বামপন্থী দল। তাঁরা সরকার 'কুসংস্কারকে প্রশয় দিচ্ছে' বলে অভিযোগ করেন। বি জে পি নেতা নরেন্দ্র মোদি ঘটনাটি তাদের পক্ষে যাবে না ভেবে ঘুরিয়ে বলেন 'স্বপ্নের সোনার পিছনে না ছুটে সরকারের উচিৎ বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধার করা।' এই মন্তব্যের পর তাঁর মনে হয় ঐ বক্তব্য তাঁকে সাধু বিরোধী, ধর্মবিরোধী প্রতিপন্ন করে তুলতে পারে, এতে দলের ক্ষতি হতে পারে। সাথে সাথেই তিনি ক্ষমা চেয়ে বলেন যে সাধুর দেখা স্বপ্নাদেশের বিরোধিতা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সাধু শোভন সরকারকে শ্রদ্ধা করেন।

যাই হোক অনেক খোঁড়াখুঁড়ির পরও মিলল না স্বপ্নের সোনা। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পেল কিছু ভাঙা কাঁচের চুরি ও প্রাচীন কালের মাটির বাসন-কোসনের টুকরো। গ্রামে গঞ্জে পুকুর খনন করে যা অনেক মানুষই পেয়ে থাকেন।

এতক্ষণ যা বলা হল তা আপনাদের কাছে নতুন নয়। সংবাদপত্রে এবং টেলিমিডিয়ায় তা প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘটনা দেখে প্রতিটি বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ স্তম্ভিত। কুসংস্কারকে এই ভাবে সরকারের প্রশয় দেওয়ার জন্য অনেকেই হতবাক। জি এস আই এর কয়েকজন বিজ্ঞানীর (বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে) কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিলঃ **আপনাদের দপ্তর তো পূর্ব পরিকল্পনামত ঐ অঞ্চলে সমীক্ষা করতে যায় নি মন্ত্রীর মেল পেয়েই অভিযানে গেছে। আপনাদের সমীক্ষা রিপোর্টে তো স্পষ্টই বলা আছে স্বপ্নাদেশের ভিত্তিতে মন্ত্রীর মেল পেয়ে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। দেশের এত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিকদের প্রতিষ্ঠান এমন কাজ করল কিভাবে?** নাম প্রকাশে ইচ্ছুক নন ২ জন জি এস আই-এর ভূ-বিজ্ঞানীরা সকলেই বলেছেন–**"এটা আমাদের কাছে অতি লজ্জাজনক বিষয়। আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনেকের কাছেই মুখ দেখাতে পারছি না।"**

আমরা আই এস আই-এর কোন কর্তার কাছে পৌঁছাতে পারি নি। হয়ত তাঁরাও এমন কথাই বলতেন।

যে সব মন্ত্রী, নেতা, বুদ্ধিজীবী মহল স্বপ্নাদেশের ভিত্তিতে এই খননকাজকে 'কুসংস্কারকে প্রশয় দেওয়া' বলেছেন তাঁরা কিন্তু বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন যে এই ঘটনা এদেশে নতুন নয়। প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও দেশের রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, কেন্দ্র-রাজ্যের মন্ত্রী, সরকারী আমলা, বিচারপতি এবং এমনকি ডাক্তার, শিক্ষক এবং বিজ্ঞানীরা এই কাজ করে চলেছেন।

গত ৫ই নভেম্বর দেশের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো উদ্যোগে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই প্রথম মঙ্গলগ্রহ অভিযানে পিএসএলভি রকেটের মাধ্যমে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে। এই অভিযানের সাফল্যের জন্য দেশবাসী তথা বিজ্ঞান কর্মীরা যখন অধীর আগ্রহে রয়েছেন ঠিক সেই সময়ই খবরের কাগজের পাতায় বিশাল ছবি দেখা গেল। ইসরো-র চেয়ারম্যান কে. রাধাকৃষ্ণণ গলায় মালা, কপালে তিলক কেটে প্রসাদী হাতে তিরুপতি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে। উনি নাকি অভিযানের সাফল্যের জন্য দেবতার কাছে আর্শীবাদ চাইতে গিয়েছিলেন!

অলৌকিকবাদ, ভূত-প্রেত, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হল কেন্দ্র-রাজ্যের সরকার। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিচারালয় কোথাও পূজাপাঠ অবৈধ নয়। পাঠ্যপুস্তকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস উৎপন্নকারী রচনা তো থাকেই, তার সাথে থাকে ভূত-প্রেত-জ্যোতিষে বিশ্বাস উৎপাদনকারী রচনা। কোন সরকারী বিল্ডিং তৈরীর আগে সেখানে বাস্তুপূজা হয়। কোন বাড়িতে সরকারী দপ্তর নতুন করে চালু করার আগে বাস্তুতন্ত্রের বিষারদদের ডেকে তাদের পরামর্শমত বাড়ি শুদ্ধ করে তবেই সেখানে অফিস উদ্বোধন হয়। রাজ্য সরকারের নতুন দপ্তর 'নবান্ন' এইভাবেই পথ চলা শুরু করেছে। জাহাজ জলে নামানোর আগে বাস, রেলগাড়ি উদ্বোধনের সময় হিন্দু ধর্মমতে পূজাপাঠ করে তাকে জলে ভাসান হয় বহুকাল থেকেই। দেশের রাষ্ট্রপতি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশের 'ধর্মনিরপেক্ষ' সংবিধানের প্রবর্তনের সময় থেকেই রীতি মেনে দিল্লীতে দশেরা উৎসবে রাবণ পোড়াতে যান। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীরা নিয়মিত দুর্গা, কালী, গণেশ ইত্যাদি পূজার উদ্বোধন করেন। বাংলার নয়া মুখ্যমন্ত্রী আরও এক পা এগিয়ে দুর্গাপূজোর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে মাইকে চন্ডীপাঠ করেন এবং সরকার পূজা কমিটিগুলিকে পুরস্কার দেয়।

এভাবেই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা এগিয়ে চলেছি। মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য যখন বিজ্ঞানীরা উদ্‌ঘাটন করছেন, শ্রমজীবী জনতা যখন সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক পথ খুঁজছেন, তখন ধর্ম-অলৌকিকবাদ-কুসংস্কারকে প্রশয় দান আরও বেশী বেশী করে করার দরকার পড়েছে শাসকশ্রেণীর। সুতরাং স্বপ্নাদেশের ভিত্তিতে সোনা উদ্ধারে সরকারী সংস্থাকে নামানোতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ■

রানীগঞ্জ-ঝরিয়া অঞ্চল ভয়াবহ বিপদের সামনে

হেনা পরভিনের ভাই আমাদের দেখাচ্ছেন তাঁদের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাড়ি এবং দিদির তলিয়ে যাওয়া স্থানটি (১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৩) (নিজস্ব চিত্র)

এই সেই ফাটল; যেখানে তলিয়ে গেছিল হেনা পরভিন (১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৩) (নিজস্ব চিত্র)

ভারতবর্ষে ২৪০ বছর ধরে কয়লা উত্তোলন চলছে। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কয়লা উৎপাদক অঞ্চল। রানীগঞ্জ-ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চল দেশ তথা বিশ্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়লা উৎপাদক অঞ্চল। এই উত্তোলন কালে সরকারী-বেসরকারী কোম্পানীর অতি মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদন এবং কর্তৃপক্ষের অপরিণামদর্শীতার শিকার হয়ে কত মানুষের জীবন গেছে তার হিসাব কোনদিনও করা যাবে না। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে নানা মহলের বিজ্ঞানী, শ্রমিক এবং অঞ্চলের মানুষরা জানিয়ে আসছেন যে ধস, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির কারণে এই দুই অঞ্চল এক ভয়াবহ বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে। সাম্প্রতিককালে রানীগঞ্জ কোলফিল্ডের সাঁকতোড়িয়া অঞ্চলের ঘটনায় নিহত হেনা পরভিন আমাদের আবারও সাবধান করে গেল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এখানেই রয়েছে ইসিএল-এর সদর দপ্তর। এই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে এবং সমগ্র অঞ্চলের বিপদ সম্বন্ধে চর্চা করে সমগ্র দেশবাসী তথা রাজ্যের মানুষকে এই ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচাবার তাগিদে এই রচনা প্রস্তুত করা হল।

সাঁকতোড়িয়ার মাটি ফেটে তলিয়ে গেল কিশোরী - আবারও জানিয়ে গেল দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আসানসোল - রানগঞ্জ শিল্পাঞ্চল এক ভয়াবহ বিপদের সামনে।

রানীগঞ্জ কোলফিল্ড অঞ্চলের সাঁকতোড়িয়া কলোনী। এই কলোনীর ১২ নম্বর বস্তির বাসিন্দা ছিল ১৯ বছরের হেনা পরভিন। গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭ টায় সামনের চাতালে পাশের বাড়ির বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে ছিল সে, হঠাৎ বিকট শব্দে মাটি ফেটে হাঁ হয়ে গেল। কিছু বুঝে ওঠা বা চিৎকার করার আগেই তিনফুট ব্যাসের হাঁ মুখে তলিয়ে গেল মেয়েটা। যাওয়ার আগে কোলের বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে গেল সে। গর্ত থেকে তখন বার হচ্ছে গনগনে আগুন আর প্রচণ্ড ধোঁয়া। ধোঁয়ার তীব্র ঝাঁঝ আর আগুনের জন্য গর্তের কাছে পৌঁছতে পারল না কেউ। বস্তিবাসীরা তখন সকলকে ঘর থেকে টেনে স্থানীয় ক্লাবে থাকার বন্দোবস্ত করেন।

গভীর রাতে ইষ্টার্ন কোল ফিল্ড (ই সি এল)-এর খনি দুর্ঘটনায় উদ্ধারকারী দল পৌঁছাল এলাকায়। গ্যাস নিরোধক পোষাক পরে, পিঠে অক্সিজেনের সিলিন্ডার নিয়েও তারা সেদিন গর্তের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। চারদিন পর মাটির নীচের ফুটন্ত গরম জলে সেদ্ধ হওয়া পরভিনের দেহ উদ্ধার করা হল।

গত ১৭ই নভেম্বর আমাদের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টীম যখন সেখানে পৌঁছায় তখন বস্তিবাসী মানুষেরা তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ উগরে দিলেন। ৫২ দিন পরও ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে সেখান থেকে। ঘরগুলি পুড়ে কালো হয়ে গেছে, উপরের

চাল, দেওয়াল সব ভেঙে পড়েছে। দু-বছর আগে ১০ ফুট দূরত্বের ঘরটি ফেটে তলিয়ে গেছিল, গর্তে কয়েকটি মুরগী মারা যায়। অতীতে এলাকার প্রাইমারি স্কুল, জি এম বাংলো ধসে সব ভেঙ্গে চুরে তচনচ হয়ে গেছে। বস্তির প্রায় সব ঘরগুলিতেই ফাটলের চিহ্ন। মাটিতে, রাস্তায় বড় বড় ফাটল, বস্তিবাসীদের বক্তব্য দীর্ঘদিন ধরেই এমন চলছে, সব জেনেও কেউ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। হেনার বাবা মহম্মদ আনসারি জানালেন "মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলাম। আমি দিন মজুরী করি। সবই আমার নসীব। আমায় কেউ সাহায্য করতে আসেনি। ক'দিন ক্লাবে ছিলাম। তারপর এখন ৯ নম্বরে একটা কোর্য়াটারে থাকতে দিয়েছে।" বস্তির মানুষদের বক্তব্য "এই বস্তির নীচে খনির তিনটি সুরঙ্গ আছে। মাঝে মাঝেই আগুন লাগে, ধস হয়। সব বিপদ জেনেও এখানে আছি। সবাই দিন মজুরী করে খাই।"

সাঁকতোড়িয়ায় ঢোকার মুখে সরকারী বোর্ডে সমগ্র এলাকাটি ধসপ্রবণ ও বিপজ্জনক বলে বোর্ড লাগান আছে। বোর্ড লাগিয়ে কর্তৃপক্ষ-প্রশাসন তার দায় সেরেছেন। আর বিপদের কথা জেনেও, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেখানেই বাস করছেন শ্রমজীবী মানুষ।

রানীগঞ্জ কোলফিল্ড এবং পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ঝরিয়া কোলফিল্ড অঞ্চল দেশের দুই গুরুত্বপূর্ণ কয়লা উৎপাদক অঞ্চল। রানীগঞ্জে ১৭৭৪ সাল থেকে এবং ঝরিয়ায় ১৮৮০ সাল থেকে কয়লা উত্তোলন হচ্ছে। ১৯৭৩ সালের পর রানীগঞ্জ কোলফিল্ড ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড (ই সি এল) এবং ঝরিয়া কোলফিল্ড ভারত কোকিং কোল লিমিটেড (বি সি সি এল)-এর অধীন এবং উভয়ই রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা উৎপাদনকারী সংস্থা কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড (সি আই এল) এর অধীন। বিশেষজ্ঞদের মতামত ই সি এল এর ৭টি প্রধান অঞ্চলের ৭৫৫ হেক্টর জমিতে আগুন লাগার সমস্যা আছে (যার সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে), ৭১২.৯৭ হেক্টর জমির ১৪৬ টি এলাকা ধস প্রবণ, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় আছেন ১ লক্ষ ৩৫ হাজারের বেশী মানুষ এবং ৭টি অঞ্চলে রেললাইন ও রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে ২.৯ কি.মি দীর্ঘ অঞ্চলে। ঝরিয়া কোলফিল্ড অঞ্চলের ৮৭২ টি এলাকার ১৭৮০.৬৮ হেক্টর জমি ধসপ্রবণ, আগুনের এলাকা ৭৬ টি এবং ৮৯০ হেক্টর জমি, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় আছেন ৩ লক্ষ ২৬ হাজারের বেশী মানুষ এবং রেললাইন ও রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ২টি এলাকার ২.৪ কি.মি দীর্ঘ অঞ্চল। (মানচিত্র - ১ এবং ২)

[তথ্যসূত্রঃ 'ধ্বস আগুন এবং মানুষ' - একটি উদ্যোগ প্রকাশ, ২০০৬]

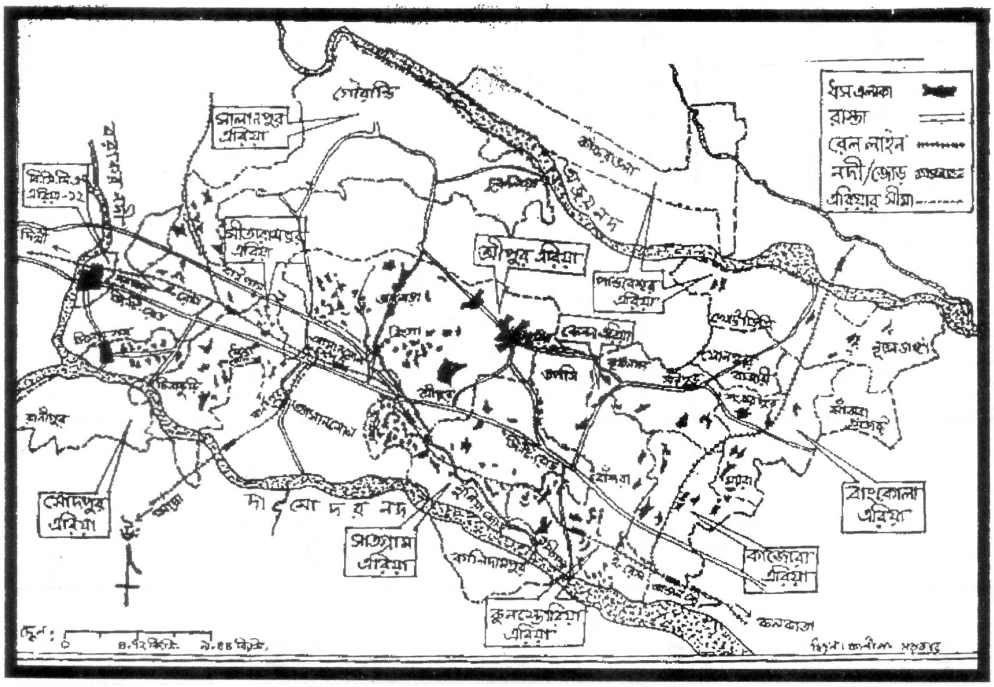

মানচিত্র ১ ঃ ইসিএল-এর ধস-প্রবণ এলাকা (সূত্রঃ ধ্বস-আগুন এবং মানুষ)

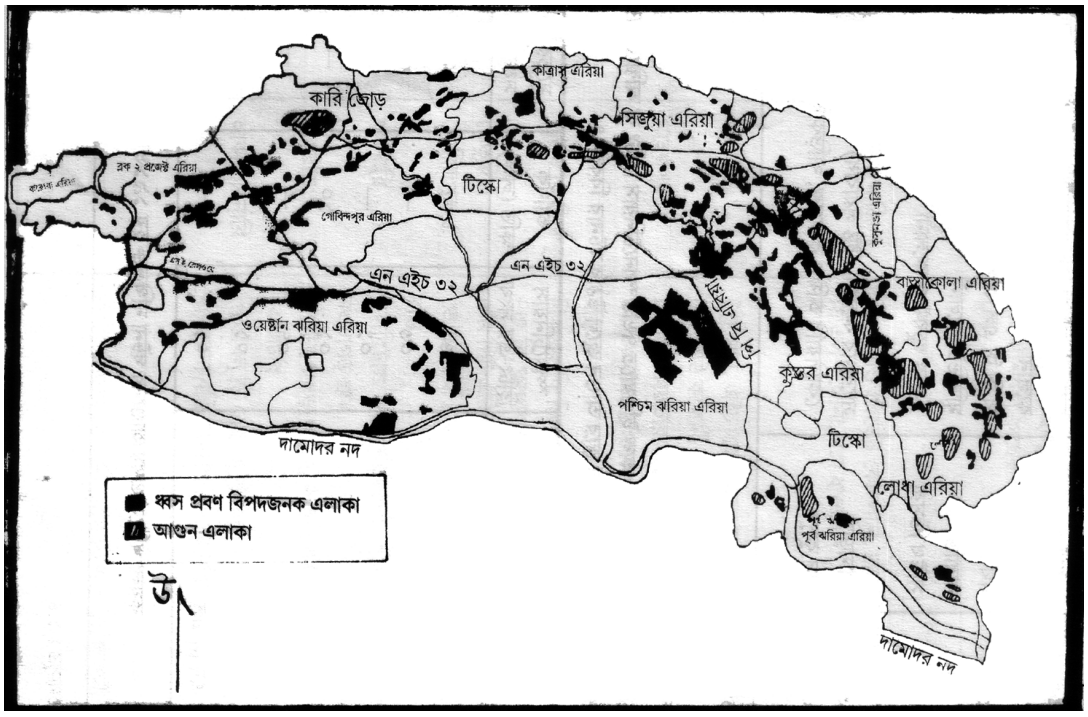

মানচিত্র ২ ঃ বিসিসিএল-এর ধস-প্রবণ এলাকা (সূত্রঃ ধ্বস-আগুন এবং মানুষ)

ধস ও আগুন প্রতিরোধে প্রশাসনিক উদ্যোগ

বিগত প্রায় শতাধিক বছর ধরে অঞ্চল দুটিতে নিয়মিত খনি দুর্ঘটনায় মৃত্যু, মাটিতে ফাটল, আগুন লাগা, ঘর-বাড়ি ভাঙা, মানুষের তলিয়ে যাওয়ার ঘটনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী, শ্রমিক সংগঠন, সামাজিক ও পরিবেশ সংগঠন, বিজ্ঞান কর্মী এবং সরকারী দপ্তরের অফিসারদের একাংশ এই বিপদসংকুল অঞ্চলের মানুষকে বাঁচাবার জন্য প্রতিবাদ করেছেন। অঞ্চল দিয়ে যাওয়া ২ নং জাতীয় সড়ক, হাওড়া-দিল্লী, আসানসোল-রাঁচীগামী রেললাইন, বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, স্কুল-কলেজ, দোকান এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচাবার তাগিদে আন্দোলন হয়েছে নানা ধরণের।

১৯২২ সালে ভারতের মাইনিং মেটালার্জিকাল এন্ড জিওলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ধস মোকাবিলার জন্য "প্রথম সাবসিডেন্স কমিটি" গঠন করে। এই কমিটি বিশেষ কিছুই করেনি। ১৯৭৩ সালে "দ্বিতীয় সাবসিডেন্স কমিটি" সবিস্তারে রিপোর্ট দেয় এবং কিছু সুপারিশ করে। কিন্তু তাদের প্রস্তাব অনুসারে প্রায় কোন কাজই হয়নি। ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত করণের পর ধসের সমীক্ষার জন্য ঘুঘনানী কমিটি গঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে এই কমিটির রিপোর্টে দেশের ৮৩ টি কয়লাখনি অঞ্চলকে ধসপ্রবণ বলে চিহ্নিত করে যার মধ্যে ই সি এল-এর ৪৫ টি অঞ্চল পড়ে।

ঘুঘনানী কমিটি যেসব সুপারিশ করেছিল তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১) যেসব ধস প্রবণ অঞ্চল কয়লা কেটে নেওয়ায় শূন্যস্থানে বা ছোট পিলারের উপর আছে সেখান থেকে বসতি সরাতে হবে।

২) যেসব ক্ষেত্রে সম্ভব শূন্যস্থান বালি দিয়ে ভরাট (স্যান্ড প্যাকিং বা স্যান্ড স্টোয়িং করাতে হবে)।

৩) ফাটলে যাতে অক্সিজেন না পৌঁছাতে পারে তার জন্য বুলডোজারের সাহায্যে মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া।

৪) বর্তমান কাজের সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও প্ল্যান তৈরী করে রাখতে হবে ইত্যাদি।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৮২ সালের ৩ রা মার্চ ইসিএল-এর চেয়ারম্যান, ইসিএল -এর ২২টি

জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে বিপদ্‌জনক ঘোষণা করেন।

১৯৮৫ সালে সি এম পি ডি আই দ্বারা "রানীগঞ্জ মাস্টার প্ল্যান" তৈরী হয় এবং রানীগঞ্জ কোলফিল্ডের ২৭ টি জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে নিরাপদ নয় বলে ঘোষণা করা হয়।

১৯৮৬ সালে ই সি এল এর চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের উদ্যোগে তৈরী হয় "প্রসাদ কমিটি"। এই কমিটি পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি অঞ্চলকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেন। ১৯৯২ এবং ১৯৯৫ সালে "অ্যাপেক্স মনিটারিং কমিটি" ইসিএল এর ৭২ টি অঞ্চলকে বিপজ্জনক চিহ্নিত করে। ১৯৯৭ সালে ডিরেক্টর জেলারেল অফ মাইনস সেফটি (ডি জি এম এস) তার রিপোর্টে ই সি এল এর ১৭১ টি অঞ্চলকে বিপজ্জনক ঘোষণা করে। [তথ্যসূত্রঃ ঐ]

নানা কমিটি গঠন, সুপারিশ প্রদান করার মধ্যেই বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধারের পরিকল্পনা ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরের আগে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের টনক নড়ে নি। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রকের সচিবের চেয়ারম্যানশিপে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গড়ে সরকার। এই কমিটিতে তৎকালীন বিহার রাজ্য সরকার (রাজ্য ভাগ হওয়ার পর ঝাড়খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্ল্যানিং কমিশন, ডি জি এম এস, শ্রমদপ্তর, কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান, ই সি এল, বি সি সি এল এবং সি এম পি ডি আই এর চেয়ারম্যানদের নিয়ে গঠিত হয়। কমিটি রানীগঞ্জ এবং ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে বিপদসংকুল এলাকাগুলি চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি পুনর্বাসন ও ধস-আগুন নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা নেয়। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যায়ে এলাকার সাংসদ তথা সিটু নেতা হারাধন রায় সংসদে সমস্যাগুলি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেন। ১৯৯৭ সালের ৩১শে জুলাই তিনি ভারত সরকারের কয়লা মন্ত্রক, সি আই এল, ই সি এল এবং বি সি সি এল এর সি এম ডি, সি এম আর আই, প্ল্যানিং কমিশন চেয়ারম্যান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শ্রম-বাণিজ্য এবং শিল্প দপ্তরের বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলা বা রীট পিটিশন (৩৮৭/৯৭) করেন। ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে সেন্ট্রাল মাইনিং এন্ড প্ল্যানিং ডেভলপমেন্ট ইনসটিটিউট লিমিটেড (সি এস পি ডি আই এল) ই সি এল এবং বি সি সি এল এলাকার জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরী করে। ই সি এল এলাকা প্রসঙ্গে মাস্টার প্ল্যানে বলা হয় ঃ

১) ২০ বছরের মধ্যে এবং ৫ বছর অন্তর অঞ্চলের ৫৯ টি অস্থিতিশীল এবং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এলাকার মাটির নীচে বালি ভর্ত্তি করতে হবে (হাইড্রো নিউম্যাটিক স্টোয়িং)

২) ২০ বছরের মধ্যে এবং ৫ বছর অন্তর চারভাগে এলাকার ৮০ টি অস্থিতিশীল এবং নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব এলাকা থেকে ৮৮৯১ টি পরিবারকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের (মাটির নীচে কয়লা নেই বা গভীরে আছে এমন এলাকায়) সঠিক পুনর্বাসন দিতে হবে। এই ৮০ টি এলাকায় পুনর্বাসন দিতে হবে অন্তত ৪৭,৩৭৬ জনকে।

৩) ১.৮ কি.মি দীর্ঘ এলাকার ৭ টি স্থানে রেলওয়ে লাইন এবং রাস্তাকে বিপদসংকুল এলাকা থেকে সরাতে হবে।

৪) ৬৪০.৮০ হেক্টর অঞ্চলের অন্তত ৭ টি পয়েন্টে নিয়মিত আগুন নেভানো বা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। [তথ্যসূত্রঃ আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটির রিপোর্ট]

বি সি সি এল এর পুর্নবাসন প্রসঙ্গে মাস্টার প্ল্যানে বলা হয়ঃ

১) ২৭১ টি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য এবং ২৬১ টি আংশিক নিয়ন্ত্রণ যোগ্য এলাকার ৩৬,২০৮ টি বাড়ি খালি করে তাদের পুর্নবাসন দিতে হবে ২০ বছরের মধ্যে।

২) ১৬ টি পুর্নবাসন প্রকল্পে ১৭৮০.৬৪ হেক্টর জমির প্রয়োজন। বি সি সি এল কর্মীরা তাদের নির্ধারিত মানের কোর্য়াটার পাবেন এবং বেআইনি দখলদার-রা 'বিস্থাপিত আবাসে' পুর্নবাস পাবেন। [তথ্যসূত্র ঃ ধ্বস-আগুন এবং মানুষ – একটি উদ্যোগ প্রকাশ ২০০৬]

২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্র সরকার অস্থিতিশীল অঞ্চলগুলিকে স্থিতিশীল করার জন্য, আগুন লাগা, ধস নামা প্রতিরোধ, স্থানীয় মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পুর্নবাসনের জন্য ১৯৯৯ সালের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সমগ্র এলাকার মানুষদের পুর্নবাসন এবং অঞ্চলকে স্থিতিশীল করা, রেলওয়ে লাইন ও রাস্তাকে বিপদ সঙ্কুল অঞ্চল থেকে সরিয়ে অন্যপথে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা তৈরী করে। রানীগঞ্জ কয়লাখনি বা ই সি এল ভুক্ত এলাকার পুর্নবাসনের জন্য আসানসোল - দুর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটিকে এবং ঝরিয়া কয়লাখনি বা বি সি সি এল ভুক্ত এলাকার পুর্নবাসনের জন্য ঝরিয়া রিহ্যাবিলিটেশন ডেভলপমেন্ট অথরিটি ঝাড়খণ্ডকে দায়িত্ব

প্রদান করে।

বিভিন্ন এলাকায় গর্ত খুঁড়ে জলের সাথে চাপের মাধ্যমে বালি ভর্ত্তি করা (hydro-pneumatic back filling with sand) করার পরও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ২০০৫ সালের অগাস্ট মাসে ডি জি এম এস একটি রিপোর্টে জানায় যে **"এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনব্যাপী স্থিতিশীলতা বিচার করার মত কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জানা না থাকায়, বালি ভর্ত্তি করা পর কোন অঞ্চল দীর্ঘদিন স্থিতিশীল থাকবে কি না তার গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। বালি ভর্ত্তি করার পদ্ধতি বা স্যান্ড স্টোয়িং ধসের প্রবণতা কমায় এটা ঠিক এবং পুনর্বাসনের জন্য কিছুটা সময় দিতে পারে মাত্র, স্থায়ী সমাধান নয়। যে সমস্ত অঞ্চলকে স্থিতিশীল করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে সেখানকার মানুষকে যত দ্রুত সম্ভব পুর্নবাসন দিতে হবে।"**

এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকারের কয়লামন্ত্রক সিদ্ধান্ত নেয় (চিঠি নং ২২০২০/২/২০০৫-সি আর সি, ১৫/১২/২০০৫)–

"যে সমস্ত এলাকায় স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য হাইড্রো নিউম্যাটিক স্টোয়িং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেই অঞ্চলের সামগ্রিক পুনর্বাসন দরকার। পুনর্বাসনের জন্য অতীতের পরিকল্পনা অনুযায়ী ছোট ছোট টাউনশিপ না গড়ে নামী নির্মার্ণ সংস্থাকে দিয়ে বড় স্যাটেলাইট টাউনশিপ (উপনগরী) গড়তে হবে।"

এই সিদ্ধান্ত মাথায় রেখে সি এম পি ডি আই এল, আর-আই ১, আসানসোল ২০০৬ সালে ই সি এল এলাকার জন্য একটি প্ল্যান তৈরী করে। নানা টালবাহানার পর ২০০৯ সালের অগাস্ট মাসে ভারত সরকার একটি সংশোধিত প্ল্যান হাজির করে। এই সংশোধিত প্ল্যান কার্যকর করার জন্য ই সি এল এলাকায় এ ডি ডি এ কে ২৬৬১.৭৩ কোটি টাকা এবং বি সি সি এল এলাকায় জে আর ডি এ কে ৭১১২.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় রানীগঞ্জ অঞ্চলে পূর্বে সি এম পি ডি আই প্রস্তাবিত ১৩টি ছোট শহরে (গোপাল পাড়া, সিতারামপুর, গৌরান্ডি, লালগঞ্জ, কৃষ্ণনগর-সোদপুর, মান্দারবনি, পাঠালবাড়ি, বনজেমারি, সাতগ্রাম, কালিদাসপুর কাংকারটোলা, নাচন, লছিপুর) এর বদলে অঞ্চলের ১৩৯ টি মৌজার মানুষদের পুর্নবাসনের জন্য দুটি এলাকায় বড় টাউনশিপ গড়া হবে।

১) বনজেমারি টাইনশিপ – ১৩০০ একর জমিতে
২) গৌরান্ডি টাউনশিপ – ২৩০০ একর জমিতে

(তথ্যসূত্র ঃ এ ডি ডি এ-র রিপোর্ট)

ঝরিয়া অঞ্চলে পুনর্বাসন এলাকা ঠিক হয়েছে ১০টি অঞ্চলে – পাত্রকোলি, ঝরনা, আমতাল এবং মহল, পালানি সাপতা, ভৌলি, নাগরিকালান, কয়লা সিটি - ২, বড়া পানডেহি, দারিদা, দহিবাড়ি/পাথবাড়ি এলাকা। (তথ্যসূত্র ঃ ধ্বস-আগুন এবং মানুষ ... ২০০৬)

এবার টাউনশিপ গড়ার জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন সামনে আসে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প এবং বাণিজ্য মন্ত্রক ৪.৬.২০১০ তারিখে জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেটে তা পাশ হয় ১৮.৮.২০১০ তারিখে। ঝাড়খন্ড রাজ্যেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত হয়। (তথ্যসূত্র ঃ এডিডিএ-র রিপোর্ট)

প্রথম থেকে ধরলে ৯১ বছর এবং ২০০৩ সাল থেকে সংশোধিত মাস্টার প্ল্যান ২০ বছরের মধ্যে লাগুর সিদ্ধান্ত ধরলে ১০ বছর পার হয়ে গেছে। ধস, আগুন নিয়ন্ত্রণ এবং পুনর্বাসন হয়েছে কতটুকু?

বিভিন্ন সরকারী রিপোর্ট, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের রিপোর্ট, এবং অঞ্চলে আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধান থেকে বলা যায় রানীগঞ্জ অঞ্চলে বিভিন্ন ধসপ্রবণ এলাকার পুনর্বাসনের যোগ্য পরিবারের সার্ভে করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে ধস নামলে এবং আগুন লাগলে তা নেভানোর জন্য বালিভর্তি করা এবং মাটি দিয়ে ফাটল বোজানো হয়েছে, পান্ডবেশ্বরের বাঙ্গালপাড়া অঞ্চলের মানুষকে সরানো হয়েছে কিন্তু অন্য কোথাও মানুষকে বিপদসংকুল এলাকা থেকে এখনও সরানো হয়নি। টাউনশিপ গড়ার জন্য জমি চিহ্নিত হয়েছে, পুনর্বাসনের জন্য ঘর নির্মাণ তো দূর জমি অধিগ্রহণ করাই হয়নি। ঝরিয়া অঞ্চলের রিপোর্টও প্রায় অনুরূপ। তবে সেখানে সরকারী জমিতে কয়েকটি ঘর বানানো হয়েছে। কোনও পুনর্বাসন বা অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কাজ হয়নি।

কয়লাখনি এলাকায় লাগাতার দুর্ঘটনা, ধস এবং আগুন লাগার কারণ কী ?

কয়লাখনি অঞ্চল বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ কোল এবং ঝাড়খন্ডের ঝরিয়া কোল ফিল্ড অঞ্চলে নিয়মিত দুর্ঘটনা, ধস আর আগুন লাগার ঘটনা দীর্ঘকাল ধরে বারে বারে ঘটে চলেছে। সমস্যা থেকে প্রতিকারের জন্য নানা কমিটি গঠন, সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে, জনগণের গণআন্দোলনের চাপে

মাস্টার প্ল্যান ইত্যাদি নেওয়া হয়েছে কিন্তু অর্থ বরাদ্দ হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এইসব দুর্ঘটনা, ধস এবং আগুন লাগার জন্য প্রাকৃতিক তথা ভূতাত্ত্বিক কারণ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে মুনাফা এবং অতিমুনাফার লক্ষ্যে দীর্ঘকালব্যাপী অবৈজ্ঞানিক খননকাজ, সর্বোচ্চ স্তর থেকে নীচুতলা পর্যন্ত দুর্নীতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব। শুরু থেকেই এই ঘটনা ঘটে আসছে। কয়লা শিল্প রাষ্ট্রয়ত্তকরণের আগে (১৭৭৪-১৯৭৩) ২০০ বছর এবং রাষ্ট্রায়াত্তকরণের পরের ৪০ বছরে এর কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি।

১৭৭৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং তার দেশী এজেন্ট (প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুরের কার এন্ড টেগোর ইত্যাদি)-দের দিয়ে মাটির অতি নিকটস্থ রানীগঞ্জ ফর্মেশন (বা শিলাস্তর) থেকে কয়লা উত্তোলন শুরু হয় কোনও বৈজ্ঞানিক নিয়ম ছাড়াই গর্ত খুঁড়ে। এরপর থেকে এখনও পর্যন্ত সেকেলে প্রযুক্তি বোর্ড এন্ড পিলার (রুম এন্ড পিলার) পদ্ধতিতে এবং ব্লাস্টিং মাইনিং পদ্ধতিতে খনন চলছে। লাভের জন্য পিলাগুলি খননের সময়ই সরু করে ফেলা হয়, ফাটল বোজানো হয় না, উপরের অঞ্চলের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার তোয়াক্কা করা হয় না, ভূগর্ভস্থ জল অনিয়ন্ত্রিতভাবে তোলা হয় ইত্যাদি। এই অবৈজ্ঞানিক খনন পদ্ধতিই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করার প্রধান কারণ।

ভূতাত্ত্বিকভাবে রানীগঞ্জ এবং ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চল অতি প্রাচীন দামোদর নদী (ও তার উপনদী শাখানদী)-র গ্রস্থ উপত্যকা (গ্রাবেনে অবস্থিত)। কয়লাস্তগুলি প্রায় অনুভূমিক (ভূমির প্রায় সমান্তরাল) এবং তার স্ট্রাইক বা বিস্তার উত্তরপূর্ব -দক্ষিণ পশ্চিম বরাবর। এই কয়লাক্ষেত্রে প্রচুর ইন্ট্রাফরমেশনাল চ্যুতি তল বা ফল্ট প্লেন আছে। চ্যুতিজনিত কারণে কয়লার সীম (স্তরগুলি) স্থানান্তরিত এবং অনেক চ্যুতিতল মাটির নীচের অনেক গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। চ্যুতিতল বরাবর অনেক ক্ষেত্রে আগ্নেয় শিলার (ডলেরাইট এবং ল্যাম্প্রোফায়ার) লম্বা-সরু ডাইক আছে যা কয়লা উত্তোলনে সমস্যা বাড়ায়। এই চ্যুতি বা প্রাকৃতিক ফাটলগুলি অক্সিজেন, জল এবং অন্যান্য তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ যাতায়াতের প্রাকৃতিক পথ, যা কয়লা – বিশেষতঃ চূর্ণীভূত কয়লার প্রাকৃতিক জ্বলনের (স্পনটেনিয়াস ইগনিশন) প্রধান প্রাকৃতিক কারণ। **একটি গ্রস্থ উপত্যকা হওয়ায় চ্যুতিতলের মাঝে মধ্যে সক্রিয়তার জন্য তা ভূস্তরকে অস্থিতিশীল করে তোলে। অবৈজ্ঞানিক খনন এই অস্থিতিশীলতাবৃদ্ধির প্রধান কারণ।** যদিও প্লেট সীমান্ত বা সক্রিয়া চ্যুতিতল অঞ্চল না হওয়ায় এলাকাটি ভূমিকম্প প্রবণ নয়। ভারতকে ভূমিকম্পপ্রবণ হিসাবে যে ৫টি জোনে ভাগ করা হয়েছে (তার মধ্যে ৫ নম্বর জোন অঞ্চল সবচেয়ে বেশী ভূকম্পপ্রবণ এবং ১ নম্বর সবচেয়ে কম ভূকম্পপ্রবণ) তার মধ্যে **এই অঞ্চল ৩ নং জোনে পড়ে এবং ভূতাত্ত্বিকভাবে মোটামুটি স্থিতিশীল।** এই অঞ্চলের ধস প্রবণতার বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেছেন ঃ আমরা ধরে নিই এই অঞ্চলের কোল সীমগুলি একটি ভিসকো-ইলাস্টিক মিডিয়ার উপর অবস্থান করছে যা খননকাজের পর (ভূস্তরের মধ্যবর্তী একটা অংশ ফাঁকা হয়ে যাওয়ায়) তির্যক শিয়ার বল দ্বারা পীড়িত হয় (ইলেক্ট্রো-ভিসকাস মডেল)। এই পীড়ন কোল সীমের উপরে থাকা পাথরের স্তরের (মূলতঃ বেলেপাথর এবং কাদাপাথর) বা ওভারবার্ডেনের দৃঢ়তা ও নমনীয়তার উপর নির্ভর করে এবং কী পদ্ধতিতে খনন হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে।

ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার, হায়দ্রাবাদ-এর বিজ্ঞানী অরিন্দম গুহ এবং কে বিনোদ কুমার পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ কোলফিল্ড অঞ্চলের বিস্তারিত গবেষণা করে ২০১২ সালের মে মাসে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। এই গবেষণাপত্রে প্রকাশিত ম্যাপে (মানচিত্র - ৩) সমগ্র রানীগঞ্জ কোল ফিল্ডের অগ্নিপ্রবণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে দুটি উপবৃত্তাকার রেখার সাহায্যে। স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সাহায্যে করা এই সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে **কয়লা থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়া রানীগঞ্জ কোলফিল্ডের একটি বৈশিষ্ট যা ঝরিয়া কোলফিল্ডের মত একই রকম বিপজ্জনক। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে আগুনের দ্বারা আক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হল রানীগঞ্জ কোলফিল্ডের উত্তর পশ্চিম অংশ; যেখানে উত্তর পূর্ব মুখী খোলামুখ খনিতে (ওপেন কাস্ট মাইনস) আগুন লেগেছে। এই আগুন লেগেছে অতি উচ্চ মানের বরাকর ফর্মেশনে (শিলাস্তরে)। জামবাদ-মঙ্গলপুর অঞ্চলের খোলামুখ খনিতেও রানীগঞ্জ ফর্মেশনের কয়লাস্তরে আগুন লেগেছে।** গবেষণায় জানা গেছে যে **কোল ফায়ার ম্যাপ এর সাথে অঞ্চলের ইন্ট্রাফরমেশনাল ফল্ট বা চ্যুতিতলের গভীর সংযোগ আছে।** এই চ্যুতির ফাটলগুলি কয়লাকে মুক্ত অক্সিজেন সরবরাহ করার দ্বারা জ্বলনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। অবৈজ্ঞানিক খনন এই প্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে। **খনিগর্ভে জমে থাকা জলের উর্ধ্বচাপের জন্য এখনও সমগ্র অঞ্চল তলিয়ে যায়নি। বৃষ্টি কম হলে, জলস্তর নেমে গেলে অথবা খননের জন্য জমা জল ফাটল দিয়ে অনেক গভীরে চলে গেলে ধস বাড়বে।**

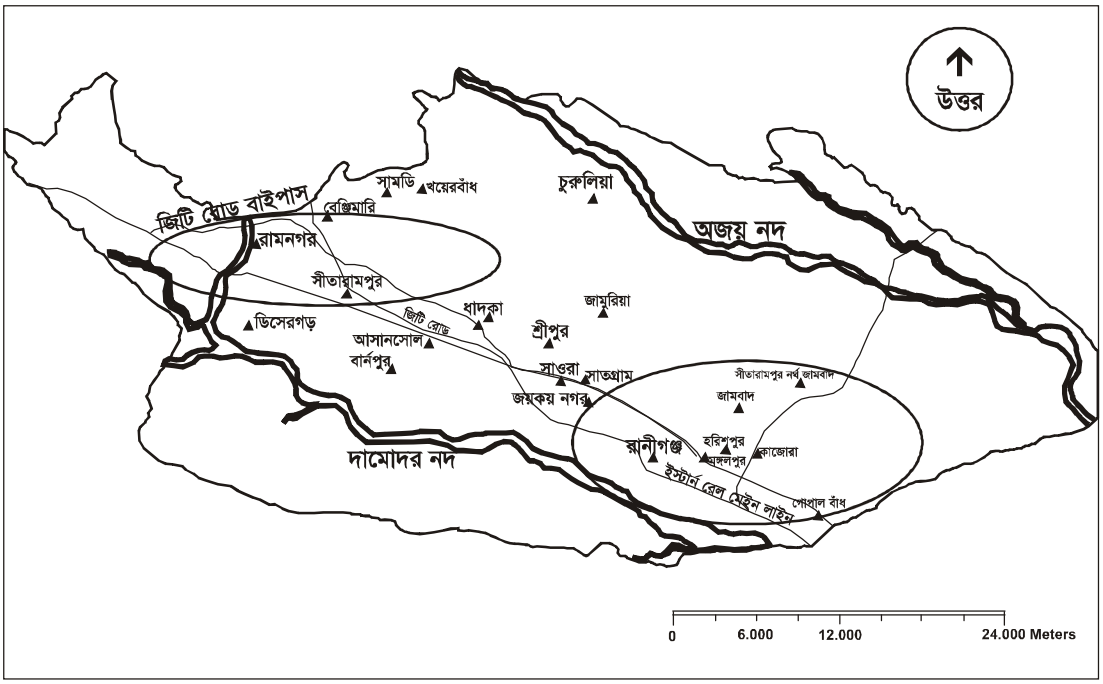

মানচিত্র ৩ ঃ রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের অগ্নিপ্রবণ এলাকা (চিত্রে উপবৃত্তের দ্বারা চিহ্নিত)
[সূত্র ঃ অরিন্দম গুহ এবং কে বিনোদ কুমার লিখিত গবেষণাপত্র মে ২০১২]

সব জেনেও এমন হচ্ছে কেন?

সব জেনেও এমন হচ্ছে বা এমন চলতে দেওয়া হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে। এর একটাই কারণ মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি। আগে দায়ী করা হত প্রাক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের অবৈজ্ঞানিক খননকাজকে। এখন এলাকায় মাফিয়াদের নেতৃত্বে চলা বেআইনী খননকাজকেই একমাত্র কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। কিন্তু ইসিএল, বিসিসিএল তথা সিআইএল যে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে "আইনীভাবে বে-আইনী" কাজ করে চলেছে তার খবর এখন আর চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। খনি অধিকর্তারাই বলছেন "সেফটির সব নিয়ম মেনে উৎপাদন করতে হলে উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হবে। লাভ হবে না।" স্যান্ড স্টোয়িং-এর নাম করে বহু ঠিকেদার শিল্পপতি (কোটিপতি) হয়ে গেছেন। তারা ১০০ বস্তার বদলে ১০বস্তা বালি ঢেলে বাকিটা পকেটে পুরছেন। দুর্নীতির ভাগ পেয়েছেন অফিসার-নেতা সকলেই। বিকল্প বাসস্থান, বিকল্প কর্মসংস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা না গড়ে বিপজ্জনক এলাকার মানুষকে যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না এটা এলাকার একটি বাচ্চা ছেলেও জানে। তবুও প্রকল্পের ঢক্কানিনাদ চলছে, সরকারী টাকায় মোচ্ছব চলছে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা জড়িত যে অঞ্চলে তাদের সহ সমস্ত সম্পদ বাঁচানোর সামাজিক তাগিদ কারও নেই। শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এটা কখনও সম্ভব নয়। একমাত্র সচেতন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পন্ন মানুষই পারেন এই বিপদের হাত থেকে সমগ্র অঞ্চলকে বাঁচানোর সংগ্রাম করতে। বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ এই গণ আন্দোলনের সাথী হতে চায়। ■

কয়লাখনিতে লাগাতার খনি দুর্ঘটনা চলছে
কর্তৃপক্ষ-প্রশাসন-সরকার নির্বিকার

২৪০ বছর অতিক্রান্ত। ১৭৭৪ সাল থেকে ইংলন্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত ধরে এদেশে কয়লা উৎপাদনের সূচনা। প্রথমে নানা দেশী-বিদেশী প্রাইভেট কোম্পানী এবং তারপর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের হাত ধরে মূলতঃ চলেছে এই উৎপাদন। বিগত শতকের শেষের দশক থেকে আবার শুরু হয়েছে আউটসোর্সিং-এর নামে প্রাইভেট কোম্পানিগুলির হাতে উৎপাদনক্ষেত্রগুলি তুলে দেওয়ার প্রয়াস। চরম নিরাপত্তাহীনতা আর শোষণের শিকার এই কয়লা শ্রমিকরা। বর্তমানে বিভিন্ন কয়লা খাদানে অস্থায়ী এবং ঠিকা প্রথায় সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন এবং নামমাত্র মজুরীতে তাঁদের কাজ করানো হচ্ছে দেশের সর্বত্র। ভূগর্ভস্থ (আন্ডারগ্রাউন্ড), ওপেন কাস্ট বা খোলামুখ খনি এবং সারফেস খনিতে প্রতিদিনই প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে দেশের কোথাও না কোথাও। নিহত, অসুস্থ অথবা পঙ্গু হচ্ছেন হাজার হাজার শ্রমিক-ম্যানেজাররা। বিগত ২৪০ বছরে কতজন শ্রমিক নিহত হয়েছেন তার তথ্য হয়ত কোনদিনও জানা যাবে না। তবে সাম্প্রতিককালের কয়েকটি দুর্ঘটনার পর সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম আসানসোল-রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে। বহু শ্রমিক, অঞ্চলবাসী, ইঞ্জিনিয়ার, সার্ভেয়ার, অঞ্চলের সামাজিক কর্মীদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছি প্রকৃত অবস্থা। কয়লা উত্তোলনের ইতিহাস, পদ্ধতি, সমস্যা, সমাধানের বৈজ্ঞানিক পথ অনুসন্ধানের প্রয়াস রেখেছি। এই রচনায় তার একটি সংক্ষিপ্তরূপ প্রকাশ করা হল।

অতি সম্প্রতি গত ১১ই নভেম্বর ২০১৩ সকালে আসানসোল সংলগ্ন ঝাড়খন্ড রাজ্যের নিরসায় ভারত কোকিং কোল লিমিটেড (বিসিসিএল)-এর বাসন্তীমাতা খনিতে ১২ নং এরিয়ার খনির ছাদ বা চাল আচমকা ধসে পড়ে সিনিয়ন ম্যানেজার অরূপ চট্টোপাধ্যায়, খনি শ্রমিক হরিলাল, লিটু সাউ এবং সীতারাম মাঝি নিহত হন। শ্রমিক এবং অফিসার্স সংগঠনের সন্দেহ দুর্ঘটনায় আরও অনেক শ্রমিক নীচে আটকা পড়ে আছেন। একজন শ্রমিক সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন যে ৯ই নভেম্বর, শনিবার থেকেই তিনি উপরের চাল খসার আওয়াজ পাচ্ছিলেন এবং পাথরের গুঁড়ো পড়তে দেখেন। রবিবার খনি বন্ধ থাকার পর সোমবার সকাল ১১টায় কয়লা কাটার সময় আচমকা চাল খসে পড়ে। বিপজ্জনক হওয়ার কারণে খনিটি মাঝে বন্ধ ছিল। ডি জি এম এস ছাড়পত্র দেওয়ায় ৬ মাস আগে পুনরায় তা চালু হয়। কয়েকবছর আগে বর্ধমান জেলার অন্ডালেও এই ঘটনা ঘটেছে।

এমন ঘটনা বার বার ঘটছে কেন তা জানতে গেলে আমাদের জানা দরকার ভারতের কয়লাভান্ডার এবং তার খননকাজের ইতিহাস। জানা দরকার খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বিজ্ঞানসম্মতভাবে খননকাজের বিধি নিয়ম, দুর্ঘটনার কারণ, তার ইতিহাস এবং মোকাবিলার পথ।

ভারতের কয়লা ভান্ডার এবং তার খননকার্যের ইতিহাস

২০১১ সালের হিসাব অনুসারে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কয়লা উৎপাদক দেশ। ২০১১ সালের রিপোর্ট অনুসারে ভারতে কয়লার ভান্ডার আছে ২৮৫ বিলিয়ন টন (২৮৫০০ কোটি টন)। ২০১০-১১ সালে দেশে কয়লা উৎপাদন হয়েছে ৫৩২.৬৯ মিলিয়ন (৫৩.২৬৯ কোটি) টন। এর মধ্যে লিগনাইট (নীচু মানের কয়লা) উৎপাদন হয়েছে ৩৭.৭৩ মিলিয়ন টন। এদেশে দুই ভূতাত্ত্বিক যুগের কয়লা পাওয়া যায় – **গন্ডোয়ানা** (প্যালিও-মেসোজোয়িক বা আজ থেকে ২৯-১০ কোটি বছরের পুরানো) এবং **টার্সিয়ারী** (আজ থেকে সাড়ে ৫ কোটি-৫০ লক্ষ বছরের পুরানো) যুগের। গন্ডোয়ানা কয়লা বিটুমিনাস এবং অ্যানথ্রেসাইট শ্রেণীর উঁচু জাতের কয়লা এবং তা কোকিং এবং নন কোকিং দুই শ্রেণীর। কোকিং কয়লা লৌহ ইস্পাত শিল্পে কাজে লাগে এবং নন কোকিং কয়লা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, সাধারণ জ্বালানি এবং নানা শিল্প দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। টার্সিয়ারী যুগের কয়লা মূলতঃ লিগনাইট শ্রেণীর এবং তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে মূলতঃ ব্যবহৃত হয়।

ভারতে গন্ডোয়ানা কয়লা পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গে (বর্ধমান

জেলার পশ্চিমাংশে, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পুরুলিয়া জেলায়), ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন প্রাচীন নদী উপত্যকায়। টার্সিয়ারী কয়লা পাওয়া যায় অসম-মেঘালয়-মিজোরাম-অরুনাচল, উত্তরাখন্ড, গুজরাত, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায়।

রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে নিম্ন গন্ডোয়ানা যুগের নন কোকিং এবং অল্প মাত্রায় কোকিং কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লাখনি অঞ্চলে থেকেই দেশে সর্বপ্রথম কয়লা উত্তোলন হয়। এটি বর্তমানে **দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ভান্ডার,** যেখানে কয়লা মজুত আছে প্রায় ৮৫২.৮৫ মিলিয়ন টন। রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বীরভূমের সংলগ্ন অঞ্চল এবং ঝাড়খন্ডের ধানবাদ জেলার অংশ নিয়ে বিস্তৃত এবং সমগ্র এলাকা ধরলে কয়লা উত্তোলন হয় প্রায় ৪৪৩.৫ বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে। এই কয়লাখনি অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় নিম্ন গন্ডোয়ানা যুগের বরাকর এবং রানীগঞ্জ ফর্মেশনে (শিলাস্তরে)। রানীগঞ্জ ফর্মেশন থেকে কয়লা উত্তোলন করা হয় রানীগঞ্জ, পান্ডবেশ্বর, কাজোরা, ঝাঁঝরা, বাঙকোলা, কেন্দা, সোনপুর, কুসুমতোরিয়া, সাতগ্রাম, শ্রীপুর, সোদপুর এবং অংশতঃ সালানপুর বাজারী কোলিয়ারী থেকে। বরাকর ফর্মেশন (রানীগঞ্জ ফর্মেশন থেকে নীচে পাওয়া যায়) থেকে কয়লা উত্তোলন করা হয় সালানপুর এবং মগমা (ধানবাদ জেলা) কোলিয়ারী থেকে।

সম্প্রতি ওএনজিসি (অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন) দামোদর ভ্যালী'র ঝরিয়া, বোকারো, উত্তর করণপুরা এবং রানীগঞ্জের খনিগর্ভে প্রচুর মিথেন জ্বালানির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে এবং বর্তমানে এই মিথেন উত্তোলনের জন্য দেশী-বিদেশী কোম্পানিগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল থেকে বর্তমানে এসার অয়েল কোম্পানি এবং জিইইসিএল (গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি করপোরেশন লিমিটেড) মিথেন উত্তোলন করছে।

ভূতাত্ত্বিকভাবে এই অঞ্চলের কয়লাস্তরগুলি প্রায় অনুভূমিক (ভূমির সাথে প্রায় সমান্তরাল) এবং এর স্ট্রাইক বা বিচার উত্তর পূর্ব–দক্ষিণ পশ্চিম বরাবর। এই কয়লাক্ষেত্রে অসংখ্য ইন্ট্রাফরমেশনাল ফল্ট বা চ্যুতি দেখা যায়। এই কয়লাক্ষেত্রের মধ্যে মূলতঃ চ্যুতিতল বরাবর আগ্নেয়শিলার লম্বা-সরু ডাইক পাওয়া যায় যা কয়লা উত্তোলনে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং খরচ বাড়ায়। কয়লাক্ষেত্রের মধ্যে থাকা এই চ্যুতিগুলি কয়লার স্তর (কোল সীম)গুলিকে কেটে স্থানান্তরিত করেছে এবং তাদের অনেকগুলিই মাটির গভীর পর্যন্তবিস্তৃত। এই চ্যুতি বা ফাটলগুলি অক্সিজেন, জল এবং অন্য তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ যাতায়াতের প্রাকৃতিক পথ, যা কয়লা – বিশেষতঃ চূর্ণীভূত কয়লার প্রাকৃতিক জ্বলনে প্রধান প্রাকৃতিক কারণ। একটি গ্রস্থ উপত্যকা বা গ্র্যাবেনে এই কয়লাক্ষেত্র হওয়ায় চ্যুতিতলের সক্রিয়তার জন্য তা ভূস্তরকে অস্থিতিশীল করে তোলে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খননকাজ এই অস্থিতিশীলতা বাড়িয়ে দেয়। যদিও প্লেট সীমান্ত অঞ্চল বা সক্রিয় চ্যুতিতল অঞ্চল না হওয়ায় এলাকাটি ভূমিকম্পপ্রবণ নয় (জোন ৩)। অবৈজ্ঞানিক খনন কাজই এই অঞ্চলের অস্থিতিশীলতার জন্য প্রধানভাবে দায়ী। এই অঞ্চলের ধস প্রবণতার বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেছেন ঃ **আমরা এই অঞ্চলের কোল সীমগুলিকে ধরে নিই তার একটি ভিসকো-ইলাস্টিক মিডিয়ার উপর অবস্থান করছে যা খননকাজের পর (ভূস্তরের মধ্যবর্তী একটা অংশ ফাঁকা হয়ে যাওয়ায়) তির্যক শিয়ার বল দ্বারা পীড়িত হয় (ইলেক্ট্রো ভিসকাস মডেল)। এই পীড়নের মাত্রা কোল সীমের উপারে থাকা পাথরের স্তরের (মূলতঃ বেলেপাথর এবং কাদা পাথর) বা ওভারবার্ডেনের দৃঢ়তা ও নমনীয়তার উপর নির্ভর করে এবং কী পদ্ধতিতে খনন হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে।**

১৭৭৪ সালে জন সামার এবং গ্রান্ট হিটলীর নেতৃত্বে ইংলন্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দামোদর উপত্যকার উত্তর পাড়ের রানীগঞ্জ অঞ্চলে প্রথম কয়লা খনন শুরু করে মূলতঃ জাহাজ ও রেল লাইনের স্টীম ইঞ্জিনের প্রয়োজনে। এই অঞ্চলে কয়লার একাংশ মাটির উপর এবং মাটির খুব কাছাকাছি থাকায় এই অঞ্চলে খনন করা সহজ ছিল। প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুরের কার এন্ড টেগোর কোম্পানি সহ বহু দেশী কোম্পানি প্রথমে মূলত কমিশন এজেন্ট হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এই কাজে সহায়তা করত। এরপর পয়সাওয়ালা নানা রাজা-জমিদার-ব্যবসায়ীরা কয়লা খননে পুঁজিনিবেশ শুরু করে। প্রথমে কয়লা খনন হত প্রাচীন পদ্ধতিতে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতিও ছিল না। ১৮৫৩ সালে উৎপাদন দাঁড়ায় ১০ লক্ষ টন। বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৪২) যুদ্ধের প্রয়োজনে তা আরও বেড়ে হয় ২৯০ লক্ষ টন।

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার রেল কোম্পানিগুলির অধীন কয়লাখনিগুলি অধিগ্রহণ করে এবং এগুলিই কয়লা উৎপাদনের মুখ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ওই বছরই সিঙ্গারেনি কোলিয়ারি কোম্পানি লিমিটেড (এস সি সি এল)-কে

অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার অধিগ্রহণ করে। এই দুটি কোম্পানিই হল দেশের প্রথম দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা উত্তোলনকারী কোম্পানি।

গত শতাব্দীর ৫-এর দশকে নানা রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত প্রকল্প, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি, রেলপথের বিকাশ ইত্যাদির প্রয়োজনের কোকিং এবং নন কোকিং কয়লার প্রয়োজন বেড়ে চলে। দেশের তৎকালীন প্রাইভেট কয়লা ক্ষেত্র থেকে এই চাহিদা মিটছিল না। বিদেশ থেকে চড়া দামে আমদানী করতে হচ্ছিল। ১৯৭১-৭২ সালে কেন্দ্র সরকার ইস্পাত শিল্পগুলির প্রয়োজনে প্রথমে ভারত কোকিং কোল লিমিটেড (বিসিসিএল) গড়ে কোকিং কয়লা উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির জাতীয়করণ শুরু করে। ১৯৭১ সালে ইমার্জেন্সি প্রভিশন অ্যাক্ট অনুসারে কোকিং কয়লাক্ষেত্র এবং কোক ওভেনগুলি জাতীয়করণ শুরু করে। ১৯৭২ সালে কোকিং কোল মাইনস ন্যাশনালাইজেশন অ্যাক্ট অনুসারে কেন্দ্র সরকার টিসকো (টাটা আয়রন এন্ড স্টিল) অধীনস্ত খনিগুলি বাদে দেশের সমস্ত কোকিং কয়লা এবং কোক ওভেনগুলিকে জাতীয়করণ করে। ১৯৭৩ সালে টিসকো ব্যাতীত সকল কোকিং এবং নন কোকিং কয়লাক্ষেত্রগুলি সরকার অধিগ্রহণ করে। এই আইন লাগু হয় ১লা মে ১৯৭৩ সালে।

জাতীয়করণের ফলে অনেক রুগ্ন কয়লাক্ষেত্রের মালিক আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যায়। কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পুরানো খনিগুলিতে এবং নতুন নতুন এলাকায় কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কার এবং উত্তোলনে প্রচুর পুঁজি নিবেশ হয়। ইঞ্জিনিয়ার, ভূবিজ্ঞানী, ডাক্তার এবং প্রশাসনিক পদে অনেক কর্মসংস্থান হয়। শ্রমিকদের জন্য একইরকম বেতন কাঠামো গড়ে ওঠে কিন্তু খননকাজে মানব সমাজের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি লাগু হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অগ্রগতি ঘটে না। পুরানো প্রাইভেট কোম্পানিগুলির মত সরকারী ক্ষেত্রেও উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা থাকায় পরিস্থিতির বদল হয় না। ১৯৭৫-৭৬ সালে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা উদ্যোগের নাম হয় কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড। বর্তমানে এই সিআইএল-এর অধীনে আছে বিসিসিএল, সিসিএল, ইসিএল, ডবলিউ সি এল, এমসিএল, এনসিএল, এসইসিএল, সিএমপিডিআইএল, বিভিন্ন কোল ওয়াশারি প্ল্যান্ট বা কয়লা ধৌতিকরণ প্ল্যান্ট ইত্যাদি। ২০০৮-০৯ সালে কেন্দ্র সরকার কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডকে নবরত্ন উপাধি দেয় অর্থাৎ দেশের প্রধান নয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানীর মর্যাদা দেয়। ২০০৭-০৮ সালে কোল ইন্ডিয়া আফ্রিকার মোজম্বিকে কোল ইন্ডিয়া আফ্রিকানা লিমিটেডা, সিআইএল-এর শাখা কোম্পানি গড়ে তোলে। **২০০৯ সালে কোল ইন্ডিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় কয়লা উৎপাদনকারী কোম্পানী হিসাবে স্বীকৃতি পায়।** ২০১১ সালে কোল ইন্ডিয়া কয়লাখনির অভ্যন্তরে সঞ্চিত জ্বালানী গ্যাস মিথেন উত্তোলনের জন্য প্রাইভেট কোম্পানিগুলির সাথে চুক্তি করে। এরপর থেকে রানীগঞ্জ-ঝরিয়া প্রভৃতি কোলফিল্ডে মিথেন উত্তোলন শুরু হয়। বর্তমানে এসার অয়েল কোম্পানি এবং জি ই ই সি এল মিথেন উত্তোলন করছে। উত্তোলনের পর মিথেনের সাথে ওঠা জলে প্রচুর বিষাক্ত পদার্থ থাকে। অভিযোগ উঠেছে এসার কর্তৃপক্ষ এই টক্সিক জল শোধন না করেই এলাকায় বায়ুদূষণ প্রতিরোধের নাম করে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। অঞ্চলে বিভিন্ন কৃষকের জমি এবং সরকারী খাস জমি জোর করে দখল নিচ্ছে।

খনি থেকে কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি

কত কম খরচে কয়লা মাটির নীচ থেকে উত্তোলন করা যাবে তার ভিত্তিতে খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়। এর সাথে উত্তোলন জনিত পরিবেশ দূষণের বিষয়টিও মাথায় রাখার নিয়ম আছে। কয়লাস্তর (কোল সীম)-এর গভীরতা, গুণমান, ভূতাত্ত্বিক অবস্থান এবং পরিবেশগত বিষয়কে মাথায় রেখে পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়। আরও বিস্তারিতভাবে বললে – অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা, ওভারবার্ডেন (কয়লা ক্ষেত্রে কয়লা ছাড়া যে শিলাগুলি পাওয়া যায় যা খননে খরচ আছে অথচ লাভ নাই)-এর চরিত্র, কয়লাস্তর কতটা অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত, কয়লাস্তরের বেধ, গঠন, গুণমান এবং কয়লাস্তরের উপরের শিলাস্তর (রুফ বা ছাদ) এবং নীচের শিলাস্তরের (ফ্লোর বা মেঝে) স্ট্রেন্থ বা ভার বহনের সক্ষমতা, টোপোগ্রাফি বা ভূপ্রকৃতি (বিশেষতঃ উচ্চতা এবং জমির ঢাল), জলবায়ু, অঞ্চলের নদীগুলির বৈশিষ্ট্য (সারফেস ড্রেনেজ প্যাটার্ন), ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থা এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থার উপর খননের প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করা হয়।

সাধারণত ভূমি থেকে ৫০ মিটার এবং এমনকি ১০০ মিটার গভীর পর্যন্ত কয়লাস্তরকে উপর থেকে খোলামুখ খনি (ওপেন কাস্ট মাইনিং) থেকে খনন করা হয়। আর ১০০ মিটার থেকে ৪৫০ মিটার গভীরের কয়লাস্তর ভূগর্ভস্থ খনি (আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন) থেকে খনন করা হয়। বিশ্বজুড়ে কয়লা খননের ৬০ ভাগ হয় ভূগর্ভস্থ খননে এবং ৪০ ভাগ খোলা মুখ খনন দ্বারা।

সারণী ১

স্বাধীনতার পরবর্তীতে ভারতের কয়লাক্ষেত্রে প্রধান প্রধান দুর্ঘটনা (১৯৫২-২০০৫)

ক্রমিক সংখ্যা	দুর্ঘটনার দিন	খনির নাম	মৃতের সংখ্যা	কারণ
১	১২.০৭.১৯৫২	ধেমো মেইন	১২	ছাদে ধস
২	০৫.০৮.১৯৫৩	মাজরি	১১	খনিতে জল ঢুকে
৩	১৪.০৩.১৯৫৪	দামরা	১০	খনির অভ্যন্তরে দাহ্য পদার্থের বিস্ফোরণ
৪	১০.১২.১৯৫৪	নিউটন চিকলি	৬৩	খনিতে জল ঢুকে
৫	০৫.০২.১৯৫৫	আমলাবাদ	৫২	খনির অভ্যন্তরে দাহ্য পদার্থের বিস্ফোরণ
৬	২৬.০৯.১৯৫৬	বুড়া ধেমো	২৮	খনিতে জল ঢুকে
৭	১৯.০২.১৯৫৮	চিনাকুড়ি	১৭৫	খনির অভ্যন্তরে দাহ্য পদার্থের বিস্ফোরণ
৮	২০.০২.১৯৫৮	সেন্ট্রাল ভৌরা	২৩	খনিতে জল ঢুকে
৯	০৫.০১.১৯৬০	দামুয়া	১৬	খনিতে জল ঢুকে
১০	২৮.০৫.১৯৬৫	ধোরি	৩৭৫	কয়লার কুঁচির বিস্ফোরণে
১১	১১.০৪.১৯৬৮	ওয়েস্ট চিরমিরি	১৪	খননকাজের সময় ধস
১২	১৮.০৩.১৯৭৩	জিতপুর	৪৮	খনির অভ্যন্তরে দাহ্য পদার্থের বিস্ফোরণ
১৩	০৮.০৮.১৯৭৫	কেসুরগড়	১১	ছাদে ধস
১৪	১৮.১১.১৯৭৫	শিলেওয়ারা	১০	খনিতে জল ঢুকে
১৫	২৭.১২.১৯৭৫	চাসনালা	৩৭৫	খনিতে জল ঢুকে
১৬	১৬.০৯.১৯৭৬	সেন্ট্রাল সাউন্দা	১০	খনিতে জল ঢুকে
১৭	০৪.১০.১৯৭৬	সুদামডি	৪৩	খনির অভ্যন্তরে দাহ্য পদার্থের বিস্ফোরণ
১৮	২২.০১.১৯৭৯	বারাগোলাই	১৬	জ্বলনশীল পদার্থে আগুন
১৯	২৪.০৮.১৯৮১	জগন্নাথ	১০	জল এবং গ্যাস বিস্ফোরণ
২০	১৬.০৭.১৯৮২	টোপা	১৬	ছাদে ধস
২১	১৪.০৯.১৯৮৩	হুরিলাডি	১৯	খনিতে জল ঢুকে
২২	১৩.১১.১৯৮৯	মহাবীর	৬	খনিতে জল ঢুকে
২৩	২৫.০১.১৯৯৪	নিউ কেন্দা	৫৫	আগুন গ্যাসের জন্য শ্বাসকষ্ট
২৪	২৬.০৯.১৯৯৫	গাসলিটাঁড়	৬৪	খনিতে জল ঢুকে
২৫	০৬.০৭.১৯৯৯	প্রাসকোল	৬	ছাদে এবং দেওয়ালে ধস
২৬	২৪.০৬.২০০০	কাওয়াডি	১০	ওপেন কাস্টের বেঞ্চের পতন
২৭	০২.০২.২০০১	বাগডিগি	২৯	খনিতে জল ঢুকে
২৮	০৫.০৩.২০০১	দুর্গাপুর রায়তওয়ারি	৬	খনিতে ধসে পড়া পাথরের স্তর
২৯	১৬.০৬.২০০৩	গোদাবরি খনি-৭এলইপি	১৭	খনিতে জল ঢুকে
৩০	১৬.১০.২০০৩	জিডিকে-৪এ	১০	ছাদে ধস
৩১	১৫.০৬.২০০৫	সেন্ট্রাল সাউন্দা	১৪	খনিতে জল ঢুকে

সারণী ২

কোল ইন্ডিয়ার বিভিন্ন শাখা, সিঙ্গারেনি কোলিয়ারি (এস সি সি এল) এবং এন এল সি সহ বিভিন্ন কোম্পানিতে একটি বছরে ঘটা দুর্ঘটনা (২০১১)

কোম্পানি	মারাত্মক দুর্ঘটনা	মৃতের সংখ্যা	গুরুতর দুর্ঘটনা	গুরুতর আহত
ই সি এল	৭	৭	৩৫	৩৮
বি সি সি এল	৭	৮	৩৩	৩৮
সি সি এল	৬	৬	১৪	১৪
এন সি এল	৪	৪	৫	৬
ডব্লু সি এল	১০	১০	৪০	৪৪
এস ই সি এল	১৪	১৪	৩৮	৩৯
এম সি এল	৫	৫	৮	৮
এন ই সি	২	২	০	০
সি আই এল	৫৫	৫৬	১৭৩	১৮৭
এস সি সি এল	৮	৮	৩১৮	৩১৯
এন এল সি	২	৩	৪	৫

সারণী ৩

ভারতের বিভিন্ন খনিতে ঘটা মারাত্মক দুর্ঘটনা (১৯৮৯-১৯৯৭)

কোম্পানি	ভূগর্ভ খনিতে দুর্ঘটনার সংখ্যা	খোলা-মুখ খনিতে দুর্ঘটনার সংখ্যা	সারফেস খনিতে দুর্ঘটনার সংখ্যা	মোট দুর্ঘটনার সংখ্যা
ই সি এল	১৫৯	২১	৩৭	২১৭
বি সি সি এল	১৯৯	৪০	৪৮	২৮৭
সি সি এল	৪৮	৫৫	৪৮	১৫১
এন সি এল	হিসাব নেই	২৫	৮	৩৩
ডব্লু সি এল	৮৬	২৪	১৪	১২৪
এস ই সি এল	১০০	৩৩	৩০	১৬৩
এম সি এল	১০	১২	১৩	৩৫
এন ই সি	১০	৩	০	১৩
মোট	৬১২	২১৩	১৯৮	১০২৩

বর্তমানে ওপেন কাস্ট এবং সারফেস মাইনিং (শুধুমাত্র মাটির উপর থেকে কয়লা তুলে নেওয়া হয়) বিশ্বজুড়ে তিনটি প্রক্রিয়ায় হয় –

ক) **এরিয়া মাইনিং বা অঞ্চলজুড়ে খনন –** উপরের ওভারবার্ডেন কেটে তুলে নীচের কয়লাস্তরকে খনন করা। সমতল অঞ্চলে এই পদ্ধতি উপযুক্ত। এই ধরনের খননের মেয়াদকাল ৫০ বছর বা তার অতিরিক্ত হয়।

খ) **কনটুর রিমুভাল মাইনিং –** পাহাড়ি এলাকায় এবং যেখানে ভূমির ঢাল বেশী সেখানে ভূপৃষ্ঠের যে উচ্চতর কয়লাস্তর পাওয়া যায় তা বরাবর ভূমির সমান্তরালে খনন করা হয় পাহাড়ের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য।

গ) **মাউনটেনটপ রিমুভাল মাইনিং –** পাহাড়ের মাথায় কয়লাস্তর থাকলে পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত শিলাস্তর কেটে নীচের কয়লাস্তরকে খনন করা হয়। এটি একটি সারফেস মাইনিং পদ্ধতি।

বিজ্ঞানীরা ওপেন কাস্ট মাইনিং করার অনুমতি দেন সেই অঞ্চলে যেখানে কয়লাস্তর মাটির কাছাকাছি আছে এবং যে অঞ্চলে জনবসতি বা শিল্পক্ষেত্র নাই। এই পদ্ধতি এবং সারফেস মাইনিং-এর ফলে বায়ুদূষণ বাড়ে, ভূমির জলস্তরে সমস্যা হয়, যান্ত্রিক দুর্ঘটনা এবং কয়লার স্বতঃস্ফূর্ত জ্বলনের প্রবণতা বাড়ে, প্রচুর জমির অপচয় হয়। কিন্তু যন্ত্রের বিকাশের ফলে এই পদ্ধতি অধিক মুনাফাদায়ী।

ভূগর্ভস্থ বা আন্ডার গ্রাউন্ড খনন করার নানা পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

ক) **রুম এন্ড পিলার মাইনিং (বা বোর্ড এন্ড পিলার)** – প্রাচীনকাল থেকেই এই পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে। মাটির গভীরে কয়লা কাটার সময় ছাদের স্থিতাবস্থার জন্য একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর কয়লা না কেটে ছেড়ে যাওয়া হয়। এই না কাটা কয়লাই পিলার আকারে উপরের ছাদকে ধরে রাখে। পিলার হিসাবে সঞ্চিত কয়লার প্রায় ৪০ শতাংশ ছেড়ে চলে যাওয়া হয়। বহুক্ষেত্রেই খনি শ্রমিকরা অভিযোগ করেন খনি কর্তৃপক্ষ অতি মুনাফার জন্য ছেড়ে যাওয়া পিলারগুলি সরু করে ফেলে। অভিযোগ উঠেছে খনির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেখানোর জন্য কর্তৃপক্ষ পিলার সরু করে এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে ডিপিলারিং করে ইয়ার এন্ডিং এর সময়। এর ফলে খননকাজ চলার সময় প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই সারা বিশ্বে এবং এদেশের অধিকাংশ খনিতে এই পদ্ধতি চালু আছে। পরে রিট্রিট মাইনিং পদ্ধতিতে ছেড়ে যাওয়া কয়লা সন্তর্পণে বিস্ফোরকের ব্যবহার করে তা কেটে ফেলা হয়। তখন উপরের ছাদ ফাঁকা খনিতে ভেঙে পড়ে। এর ফলে প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে।

খ) **ব্লাস্ট মাইনিং –** এটি একটি প্রচলিত পদ্ধতি যেখানে ডিনামাইটের মত বিস্ফোরকের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথরের স্তর এবং কয়লাস্তর একসাথে ভেঙ্গে, কয়লার টুকরোগুলি কনভেয়ার গাড়ির সাহায্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বারে বারে বিস্ফোরণ এবং শাবল গাইতির সাহায্যে সেই কয়লা ভেঙ্গে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই পদ্ধতি বার বার প্রয়োগে শিলাস্তরের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়, বিস্ফোরণের সময় এবং তারপর কয়লা কাটতে গিয়ে প্রচুর খনি দুর্ঘটনা ঘটে। উন্নত দেশগুলি বর্তমানে এই পদ্ধতির প্রয়োগ কমিয়ে দিয়েছে। চীন, ভারত, আফ্রিকা এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে এই পদ্ধতি জারি আছে এবং লাগাতার খনি দুর্ঘটনা ঘটছে।

গ) **কনটিনিউয়াস মাইনিং** বা ধারাবাহিক মাইনিং পদ্ধতিতে বিশাল ঘূর্ণায়মান স্টীল ড্রাম (যার মাথায় টাঙস্টেন কার্বাইডের দাঁত থাকে) কোল সীমকে কাটতে কাটতে এগুতে থাকে। এই পদ্ধতিতে খনন হয় রুম এন্ড পিলার (বোর্ড এন্ড পিলারও বলা হয়)। এই পদ্ধতিতে একটা সারিতে ২০ থেকে ৩০ ফুটের রুম তৈরী করা হয়। এই মেশিন এক মিনিটে ৫ টন পর্যন্ত কয়লা কাটতে পারে। মেশিন রোবটের সাহায্যে রিমোট কন্ট্রোলে চলে এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে বড় অংশের কয়লা এই পদ্ধতিতে খনন হয়। যন্ত্রটি ২০ ফুট বা ৬ মিটার কয়লা কাটার পর রুফ বোল্টারের সাহায্যে উপরের ছাদকে ধরে রেখে আবার খননকাজ এগিয়ে নিয়ে চলা হয়।

ঘ) **লঙওয়াল মাইনিং** - পৃথিবীতে অপর এক আধুনিক পদ্ধতি যেখানে হাজার ফুট (৩০০ মিটার) বা তারও বেশী লম্বা লঙওয়াল শিয়ারার থাকে। এই উচ্চপ্রযুক্তির যন্ত্রে একটি ঘূর্ণায়মান ড্রাম থাকে যা চওড়া কোল সীম বরাবর কেটে একবার এগোয়, একবার পিছোয়। ভাঙা কয়লার টুকরোগুলি যন্ত্রের নীচে থাকা প্যানে জমা হয় এবং সেই কয়লা কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে স্থানান্তরিত করা হয়। লঙওয়াল ব্যবস্থায় নিজস্ব হাইড্রলিক রুফ সাপোর্ট থাকে, যা খননকাজ এগিয়ে চলার সাথে সাথে এগিয়ে চলে। মেসিন কয়লা কেটে এগিয়ে গেলে উপরে পাথরের স্তরকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ধসে পড়তে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে কয়লার ভূতাত্ত্বিক চরিত্র অনুসারে ৬০-১০০ শতাংশ উত্তোলন করা সম্ভব। কয়লা তোলার পর উপরের ছাদকে নিরাপদে ধসে পড়তে দেওয়া হয়। তবে এই পদ্ধতি সাধারণতঃ তুলনায় কঠিন শিলাস্তরে প্রযোজ্য।

ঙ) **শর্টওয়াল মাইনিং –** নতুন পদ্ধতি যার সাহায্যে সারা বিশ্বে ১% গভীরে থাকা কয়লা খনন করা হয়। এটা লঙওয়াল মাইনিং-এর ছোট সংস্করণ এবং একই পদ্ধতিতে খনন হয় অপেক্ষাকৃত কম বিস্তৃত কয়লাস্তর বা কোল সীমের জন্য। ৫০ মিটার থেকে ১ কিমি বিস্তৃত সীমে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

চ) **রিট্রিট মাইনিং** একটি পদ্ধতি যার দ্বারা রুম এন্ড পিলার পদ্ধতিতে কাটা কয়লার পিলারগুলি কেটে বেড়িয়ে আসা হয়। এই পিলারের কয়লাগুলি কেটে বার করার সাথে সাথে উপরের ছাদের ধস নামে। এই কারণে যতদূর পর্যন্ত কয়লা আগে কাটা হয়েছে তার আগা থেকে পিলারগুলি কেটে কেটে পিছিয়ে আসতে হয়। এই পদ্ধতির খনন সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং নিয়মিত দুর্ঘটনা ঘটে।

খনি দুর্ঘটনার কারণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বিভিন্ন খননকাজের সময় প্রাকৃতিক কারণে এবং প্রধানতঃ অবৈজ্ঞানিক ও অবিবেচকের মত মুনাফার লোভে খননকাজের ফলে প্রতিবছর পৃথিবীজুড়ে হাজার হাজার শ্রমিক মারা যান। কয়লাস্তর তুলনায় নরম ও পাললিক শিলার সাথে থাকায়, এর দৃঢ়তা ও পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা কম থাকায় পৃথিবী জুড়ে কয়লা খননের সময় দুর্ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। পুঁজিবাদে অধঃপতিত হওয়ার পর চীনে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী খনি দুর্ঘটনা দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন কয়লাখনিতে নিয়মিত এবং অন্যান্য খনিতে মাঝে মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে।

কয়লাখনিতে দুর্ঘটনার কারণগুলি সংক্ষেপে হল ঃ

ক) খনির অভ্যন্তরস্থ বিষাক্ত গ্যাস হাইড্রোজেন সালফাইড অথবা বিস্ফোরক প্রাকৃতিক গ্যাস বিশেষতঃ জ্বলনশীল পদার্থ বা মিথেনের জ্বলনের ফলে;

খ) কয়লা এবং অন্য পাথরের গুঁড়োর বিস্ফোরণ;

গ) ভূগর্ভস্থ খনির চাল বা ছাদ ধসে পড়া;

ঘ) খননকার্য জনিত (মূলতঃ অতিরিক্ত বিস্ফোরকের ব্যবহার জনিত) ভূমিকম্প;

ঙ) কয়লার স্তরে, ওভারবার্ডেনের ফাটল ধরে ভূগর্ভস্থ বা সংলগ্ন নদীর জল খনিতে ঢুকে বন্যা সৃষ্টি হয়ে;

চ) যান্ত্রিক ত্রুটি, যন্ত্রের অপব্যবহার, সেফটি ল্যাম্প বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের অপব্যবহার;

ছ) খোলামুখ খনিতে দেওয়ালে ধস নামা ইত্যাদি।

খনি দুর্ঘটনা এড়াতে যে সব ব্যবস্থা তত্ত্বগতভাবে নেওয়া হয়

কেন্দ্রীয় সরকারের কয়লা মন্ত্রকের অধীনে কয়লা খনির নিরাপত্তার জন্য একটি সেফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে ডি জি এম এস, সি আই এল এবং তার নানা শাখা সংস্থা, বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টর কোম্পানি এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি নিয়মিত বৈঠক করে নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নে, কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটেই চলে। নিরাপত্তার জন্য সেফটি কমিটি যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছে তা হল ঃ

ক) বহুবিধ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ সেফটি অর্গানাইজেশন (আইএসও) গঠন করে খনি কর্তৃপক্ষকে পরামর্শদান;

খ) আসন্ন ঝুঁকিকে হিসাব করে প্রতিটি খনির জন্য সেফটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান গঠন;

গ) সেফটি অডিট চালু করা;

ঘ) দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন –

* খনিতে জল ঢুকে বন্যা প্রতিরোধে – অঞ্চলের নদী, ভূগর্ভস্থ জলের জিওফিজিক্যাল সার্ভে করে বর্ষার আগে বিভিন্ন ফাটলগুলি বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ

* খনিতে আগুন লাগা প্রসঙ্গে – আগুন লাগা ও জ্বলতে থাকা সীমগুলি অবিলম্বে পৃথক করে বাকি অংশ থেকে তাকে মুক্ত করা। স্বতঃস্ফূর্ত কয়লা জ্বলন বন্ধ করতে এবং ফাটল রোধে আধুনিক এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন পলিইরেথেন ফোমের ব্যবহার।

এই আধুনিক ফোম ছাদের ধস প্রবণতা কমাতে কাজে লাগে। গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফ ব্যবহার করা যাতে খনির বাতাসের উপাদান সহজে ও দ্রুত হিসাব করা যায়।

* খনিতে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা সঠিক আছে কিনা এবং না থাকলে তার ব্যবস্থা গ্রহণ।

* বিস্ফোরণ বন্ধ করতে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন সেনসর এবং ক্যাটালাইটিক বেস) খনিতে গ্যাসের উপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে হিসাব করা।

* জরুরী প্রয়োজনে ব্যবস্থাগ্রহণ – জরুরী ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য সেফটি টীমের রিহার্সাল করা, আন্ডারগ্রাউন্ড খনি থেকে বিপদের সময় বেরিয়ে আসার পথ চিহ্নিত করা ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

* ছাদ বা ঢালের ধস প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত কয়লার

উপরের শিলাস্তরের জিওমেকানিক্যাল ধর্ম হিসাব করা, কার্যকরী ক্ষেত্রে খনির ফেসকে যান্ত্রিকীকরণ করা, সিমেন্টের বদলে গ্রাউটিং এর জন্য দ্রুত জমে যায় এমন পদার্থ যেমন রেজিন ক্যাপসুল ব্যবহার করা, সুনির্দিষ্টভাবে খনির সঠিক সার্ভে করা।

* খোলামুখ খনিতে দুর্ঘটনা এড়াতে – বড় বড় যন্ত্র ও গাড়িগুলির জন্য বিশেষ ট্যাফিক রুল তৈরী করা কারণ এতে চাপা পড়ে প্রচুর শ্রমিক মারা যায়, ওভারবার্ডেনের জিওমেকানিক্যাল ধর্ম হিসাব করা, বেঞ্চগুলির স্থায়িত্ব হিসাব করা, সঠিক পদ্ধতিতে সার্ভে করা, জ্বলনশীল কয়লাস্তরগুলি চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করা, কয়লা ও পাথরকুচির ধস নামা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

ভারতের কয়লা খনিতে খনি দুর্ঘটনা

ভারতের কয়লাখনিতে বর্তমান চীনের মত নিয়মিত দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। ভারতে সবচেয়ে বড় কয়লাখনি দুর্ঘটনা (যা হিসাবে আছে, কারণ অতীতে এই দুর্ঘটনাগুলিতে কত শ্রমিক নিহত হন তার হিসাব পাওয়া যেত না। কর্তৃপক্ষ হিসাব চেপে যায়; এখনও এমন প্রক্রিয়া চলে) ঘটে ধানবাদ কয়লাখনিতে ২৮শে মে, ১৯৬৫ সালে ধানবাদের ধোরি কয়লাখনিতে। সেখানে আগুন লেগে ৩৭৫ জন শ্রমিক মারা যায়। ১৯৭৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ঝাড়খন্ডের চাসনালা খনিতে বিস্ফোরণে ধস নেমে খনিতে জল ঢুকে বন্যা হয়ে ৩৭৫ জন (বাস্তবে অনেকে বেশী) শ্রমিক সরকারী হিসাবে মারা যান। নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর অঙ্গার নাটকে এর চিত্র তুলে ধরেন। ১৯৫২-২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রধান খনি দুর্ঘটনাগুলি এখানে দেওয়া হল। (চার্ট ১) ২০০৮-২০১১ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কয়লাখনিগুলিতে সরকারী হিসাবে বিভিন্ন দুর্ঘটনার চিত্র দেখলেই বোঝা এটা কত নিয়মিত ঘটছে। (চার্ট ২, চার্ট ৩, চার্ট ৪)

সারফেস, ওপেন কাস্ট এবং আন্ডারগ্রাউন্ড কয়লাখনির দুর্ঘটনাগুলিকে স্ট্যাটিসটিক্যালি বিশ্লেষণ করে আই এস আই-এর বিজ্ঞানী এ মন্ডল এবং ডি সেনগুপ্ত জানিয়েছেন যে তা সব ক্ষেত্রেই সমান হারে হয়ে চলেছে, আন্ডারগ্রাউন্ডে বেশী আর ওপেন কাস্ট বা সারফেসে কম হারে হচ্ছে এমন নয়। দুর্ঘটনার সংখ্যা আন্ডারগ্রাউন্ড খনিতে বেশী হলেও সব ধরনের খনিতেই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।

তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে চাল বা ছাদ ধসে পড়া, আগুন জ্বলা, খনিতে জল ঢুকে বন্যার মত কারণে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনস-এ দুর্ঘটনা ঘটে বেশী। অন্যদিকে দেওয়ালে ধস নেমে, যান্ত্রিক ত্রুটি, যন্ত্রে চাপা পড়ে, কয়লা ও পাথরের ধুলোয় ওপেন কাস্ট এবং সারফেস মাইনস্-এ দুর্ঘটনা ঘটে বেশী। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কোল ইন্ডিয়ার অধীন সব শাখা কোম্পানির মাইনসেই এই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে প্রায় একই হারে কিন্তু রানীগঞ্জ কোলফিল্ড এবং ঝরিয়া কোল ফিল্ড অঞ্চলে অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য ইসিএল এবং বিসিসিএল-এর কয়লাখনিগুলিতে দুর্ঘটনা ঘটে বেশী। দুর্ঘটনায় মৃতদের যে সংখ্যা সরকারীভাবে দেখানো হয় বাস্তবে তার সংখ্যা অনেক বেশী। অতীতে কাগজে কলমে কতজন শ্রমিক খনিতে নেমেছেন তার হিসাব রাখা হত না। ফলে কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর হার অনেক কমিয়ে দেখাত। এখনও চোরাগোপ্তাভাবে সে কাজ চলে যদিও কাগজে কলমে হিসাব থাকায় মৃত্যুর হার গোপন করার প্রবণতা কমেছে।

খনিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে শ্রমিক, সামাজিক ব্যক্তি ও সংগঠনগুলি লাগাতার আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী এর বিপদ এবং বিপদ থেকে উদ্ধার নিয়ে নানা গবেষণা করছেন, মতামত দিচ্ছেন কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না কেন? এই উত্তর লুকিয়ে আছে বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে মুনাফাই উৎপাদনের সার কথা। মুনাফা-অতি মুনাফার জন্য সর্বত্র সমস্ত বিধিনিষেধ ভেঙ্গে কাজ হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম কয়লা উৎপাদনকারী সংস্থা কোল ইন্ডিয়া এবং তার শাখা কোম্পানিগুলি অতীত ও বর্তমানের প্রাইভেট মালিকদের মত একই প্রক্রিয়ায় চলছে। বিধি ভেঙ্গে উৎপাদন হয়, নিরাপত্তার কথা থাকে কাগজে কলমে বাস্তবে তার ছিটে ফোঁটাও লাগু হয় না। চারদিকে চলছে সীমাহীন দুর্নীতি, মাফিয়া রাজ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব। সেফটি কমিটিগুলিকে শ্রমিকরা 'সিঙারা কমিটি' বলে ব্যঙ্গ করেন। কারণ তাঁরা জানেন যে ওগুলো কয়েক সপ্তাহ বা মাসান্তে চা-সিঙারা খেয়ে গল্পগুজব করার আর পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত লাগু করার কমিটি। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূতাত্ত্বিক, সার্ভেয়ার বা অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণে সমৃদ্ধ শ্রমিকরা প্রয়াস রাখতে চান তাঁদের সেইসব প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান লাগু করতে দেওয়া হয় না। অভিজ্ঞ শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, সার্ভেয়াররা সমীক্ষায় আমাদের জানিয়েছেন যে খনিগুলিতে সেফটির নিয়ম ০-১০ শতাংশ মাত্র লাগু হয়। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের মতামত হল "সব নিয়ম মানতে হলে উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হবে।" এখন আবার সব নিয়ম তোয়াক্কা করে ভূগর্ভে

ঠিকেদার শ্রমিকদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীনভাবে কাজ করানো হচ্ছে দৈনিক ২০০-৩০০ টাকায়। খনিতে শ্রমিকরা অসুস্থ হলে নীচে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, ল্যাট্রিন নেই, ভেন্টিলেশন নেই। 'ভগবানের ভরসায়' শ্রমিকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে বলা হচ্ছে।

বে-আইনী খাদানগুলিতে মাফিয়ারা সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীনভাবে শ্রমিকদের কাজ করাচ্ছেন। অঞ্চলের স্থিতিশীলতার ব্যাপারে তাদের কোনও দায় নেই। এইসব খাদানে চাপা পড়ে মরলে কাক-পক্ষীকেও জানানো বারণ।

কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক নেতা আর মাফিয়াদের নাগপাশে পিষ্ট হচ্ছেন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম কয়লা উৎপাদন ক্ষেত্রের শ্রমিকরা। সঠিক বৈজ্ঞানিক চেতনায় সমৃদ্ধ নেতৃত্বের অভাবে তাঁদের জীবন যাচ্ছে, পঙ্গু-অসুস্থ হচ্ছেন। নিংড়ে ছিবড়ে করা হচ্ছে তাঁদের।

এই সমস্যার কোনও চটজলদি সমাধান নেই। সচেতন, সমাজ প্রগতির পক্ষের এবং বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ যদি কয়লা তথা সব ধরনের খনি শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে এই চলতি ব্যবস্থা ভেঙে মানুষের স্বার্থে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ার সংকল্প না নিতে পারেন তবে অবস্থা যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থাকবে। ■

দাভোলকর ও কুসংস্কার

গত ২০ শে আগষ্ট মহারাষ্ট্রের পুণের ওঙ্কারেশর সেতুর কাছে ভোরে প্রাতভ্রমণের সময় অজ্ঞাত পরিচয় দুই বন্দুকবাজের গুলিতে নিহত হয়েছেন নরেন্দ্র দাভোলকর। তিনি পেশায় ডাক্তার ছিলেন। সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে তিনি ডাক্তারি পেশা ছেড়ে, মানুষকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন করার পেশায় স্বনিযুক্ত হন। দু-দশকের বেশী সময় ধরে মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তিনি এই কাজ করতেন, অনেক সময় গ্রামবাসীদের বাড়ীতেই রাত কাটাতেন। এই কাজ করার জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন "মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূল সমিতি।" কুসংস্কার বিরোধী এক বিল পাশের জন্য গত চার পাঁচ বছর ধরে তিনি মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে আবেদন করে আসছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল কুসংস্কার ও তুকতাকের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র বিধান সভায় বিল অনুমোদনের মাধ্যমে আইনের পরিবর্তন করে সংস্কার করা। কিন্তু গত সাত অধিবেশনে এই বিলের বিষয়ে কোন কথাই ওঠে নি। তাই তিনি বলেছিলেন "রাজ্যের উন্নতি চান না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই"। সম্প্রতি তিনি জাত-পাত ভিত্তিক পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় গরীব শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক অধিকার না পাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। হয়ত এই কারণেই তাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছে শাসক শ্রেণীর এক অংশ। দাভোলকরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বিরাজ চৌহান উপস্থিত হন এবং দাভোলকরের অনুগামীদের দ্বারা প্রশ্নের সম্মুখীন হন। শ্মশান ঘাটেই দাভোলকরের প্রেরিত ড্রাফ্ট'কে বিলে পরিণত করার দাবী ওঠে। পরের দিন-ই কুসংস্কার ও তুকতাক বিরোধী অর্ডিন্যান্স জারির সিদ্ধান্ত নেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। হত্যাকারীর খোঁজ দিলে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। তাঁর হত্যার প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামেন। ২১শে আগষ্ট পুণেতে ও অন্যান্য শহরে বনধ্ পালন করা হয়। দাভোলকর কুসংস্কার বিরোধী হলেও ধর্মাচরণের বিরোধী ছিলেন না। সিটু নেতা অজিত অভয়ঙ্কর বলেন "তিনি সর্বদা বলতেন যে তিনি ঈশ্বর বা ধর্মের বিরোধী নন, তিনি কেবল এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে শোষণের বিরোধী।" একটি মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশের অধিকারের দাবীতেও তিনি আন্দোলন করেন।

এখন প্রশ্ন হলো আইন করে সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করা যাবে কি? এর উত্তর জানতে হলে, জানতে হবে সমাজে কুসংস্কার টিকে আছে কেন? টিকে থাকার কারণ হল–(১) সামাজিক ও পারিবারিক ভাববাদ ভিত্তিক প্রথাগত শিক্ষা ও সেই শিক্ষার অনুশীলন, (২) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের (যেমন গবেষক, ডাক্তার, সাহিত্যিক) দ্বারা অলৌকিকবাদ ও অলৌকিক কাহিনীর প্রতি অবস্থা জ্ঞাপন ও প্রচার, (৩) রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিপোষণ; রাষ্ট্রের নায়ক, অধিনায়ক ও রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, (৪) সংবাদ মাধ্যম, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, যাত্রা ও নাট্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি দ্বারা ধর্মের মহিমা প্রচার, (৫) বৈষয়িক জীবনে অনিশ্চয়তা ও হতাশা।

আইন কি কুসংস্কার টিঁকে থাকার এই বাস্তব কারণগুলিকে অপসারিত করতে পারবে? যেখানে কুসংস্কারগুলি বিদ্যমান ব্যবস্থার ফল আর বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে নতুন আইনের প্রবর্তণ–সংস্কার মাত্র। যা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আর্থসামাজিক উৎসগুলির অবসান ঘটায় না। ■

সাক্ষাৎকার

রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে ধস-আগুন-তার প্রতিকার এবং খনি দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে

নাগরিক অধিকার কর্মী, শ্রমিক নেতা, সার্ভেয়ার এবং খনি শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার

[গত ১৬-১৭ই নভেম্বর আসানসোল-রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে ধস-আগুন লাগা এবং তার প্রতিকারে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা, লাগাতার খনি দুর্ঘটনার কারণ কী, খনি নিরাপত্তার অবস্থা কেমন ইত্যাদি প্রসঙ্গে নাগরিক অধিকারের প্রবীণ কর্মী এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ড. মুক্তেশ ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। খনি শ্রমিকদের হাল হকিকৎ জানতে সিআইটিইউ অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রী সুজিত মাঝি এবং অভিজ্ঞ কর্মী এবং আন্ডারগ্রাউন্ড খনির সার্ভেয়ার শ্রী কৌশিক হালদারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এছাড়া ধেমো মেইন ও নরসুমুদা খনির শ্রমিকদেরও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। পত্রিকার স্থান সংকুলানের জন্য অতি সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হল। আশাকরি পাঠকরা উপকৃত হবেন। –সম্পাদকমন্ডলী]

আসানসোল সিভিল রাইটস সংগঠনের ডঃ মুক্তেশ ঘোষ

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ এই কয়লাখনি অঞ্চলের ধস, আগুন লাগা এবং তার প্রতিকার নিয়ে সামাজিক আন্দোলনে আপনি দীর্ঘদিন যুক্ত। বর্তমান অবস্থা কেমন?

ডঃ মুক্তেশ ঘোষ ঃ আমার জন্ম রানীগঞ্জে। দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে বাস করি। ছোটবেলা থেকেই এই সব ধস, আগুন লাগা, দুর্ঘটনার সাথে পরিচিত। এখানকার মানুষ এসবে অভ্যস্ত। হারাধন রায় এই অঞ্চলের আসন্ন বিপদ নিয়ে লাগাতার আন্দোলন করেছিলেন। উনি একটি জনস্বার্থে মামলা করেছিলেন। ১০ বছর মামলা চলেছিল। মামলা চলার সময় সুপ্রিম কোর্টকে কেউ চিঠি দিতে পারে না। তবুও উনি চিঠি লিখলেন, বললেন কিছুদিনের মধ্যে মরে যাব, আমি মরার আগে সমগ্র এলাকাকে বাঁচানোর জন্য একটা পরিকল্পনা হচ্ছে দেখে যেতে চাই। তখন কেসের ব্যাপারে অর্ডার হয়। বলা হয় রানীগঞ্জ এবং ঝরিয়া কোল ফিল্ড অঞ্চলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে এলাকার স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হবে। ২২ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ স্যাংশন হয়। ঝাড়খন্ডে তবুও কয়েকটা বাড়ি হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে কিছু হয়নি।

বি. ম. ঃ ইসিএল এলাকায় টাউনশিপ ...

ডঃ ঘোষ ঃ কিছু হয়নি। এখানে ১৫৫০ বর্গ কিমি অঞ্চল ধস প্রবণ। সাতগ্রাম, চিনাকুড়ি (সাঁকতোড়িয়া) বরাকর, সামডি

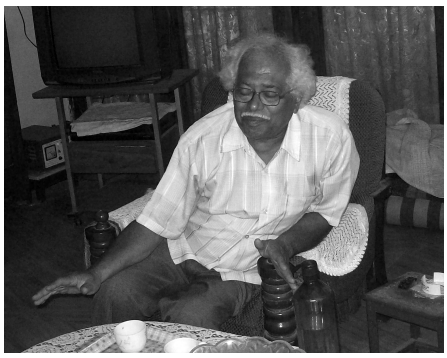

ডঃ মুক্তেশ ঘোষ

এসব এলাকায় গেলে দেখতে পাবেন। রানীগঞ্জের অবস্থা সত্যিই খারাপ। শহরের মধ্যে মাইনিং বোধহয় কোথাও দেখা যাবে না। শহরটা ভীষণভাবে অ্যাফেকটেড। নীচটা পুরো ফাঁকা, ভাসছে আর কি! মঙ্গলপুরে পুনর্বাসন হওয়ার কথা ছিল, এখন দেখছি শিল্পাঞ্চল করার চুক্তি হল। ধসের উপর মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং হচ্ছে। এই অঞ্চলে একটা নিয়ম আছে। কোন বাড়ির স্যাংশন পেতে গেলে ডিএম-এর অনুমতি নিতে হয়। তিনি ডিজিএমএস-এর কাছে সুরক্ষার রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। এসব নিয়ম সব কাগজে কলমে আছে। আমার বাড়ির পিছনে একটা কোম্পানি ১৬ তলা বাড়ি করছে। ভাবতে পারেন!

বি. ম. ঃ হারাধন রায়ের আইনী লড়াই ছাড়া এলাকায় এই নিয়ে কোনও গণ আন্দোলন হয়েছে?

ডঃ ঘোষ ঃ সরকারের তরফ থেকে সদিচ্ছা থাকলে সাধারণ মানুষ সহযোগিতা করত। এখন উল্টো হচ্ছে। বড় রাস্তার ধারে ১০০ মিটার এলাকা জুড়ে ধস নামল। সরকার এলাকা খালি করার কথা বলল। স্থানীয় লোক বলল আমরা কোথায় যাব? অর্ডার উইথড্র করতে হবে। কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। তখন অর্ডার উইথড্র করল। একটা কথা রেখে দিল – 'এটা আশঙ্কাজনক অঞ্চল'। পরবর্তীতে বড় বিপদ হলে পিঠ বাঁচানোর রাস্তা করে রাখল।

বি. ম. ঃডি জি এম এস (ডিরেক্টর জেনারেল অফ মাইন্স সেফটি)-র ভূমিকা কী?

ডঃ ঘোষ ঃ ডিজিএমএস ক্যালাস। ক্যালাস বলব না, সিস্টেমের সাথে তাল রেখে চলে। নিমতা কোলিয়ারিতে ৬০-৭০ বছর ধরে আগুন জ্বলেই চলেছে। ওখানে একটা পাথরের লেয়ার পড়াতে বাকি অংশ অ্যাফেক্টেড হয়নি। ভবিষ্যতে হতেই পারে। কোলিয়ারি অঞ্চলের মানুষ এর মধ্যেই বাস করছে, এর মধ্যেই কাজ করছে। সব গা সওয়া হয়ে গেছে। পাশে ধস নেমেছে আর এদিকে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। কালিপাহাড়ী স্টেশনের ওখানে বাইপাসে ধস নেমেছে। ওখানে একটা কুয়ো আছে, পুরানো খনি, কয়লা তুলত, চানক বলে। জল জমে থাকে। লোকে মুখটা ঢাকা দিয়ে রেখেছিল, জল নিত। গ্যাস জমে বাস্ট করল।

২০০ বছর ধরে কয়লা তোলার জন্য অঞ্চলের কৃষিটা শেষ হয়ে গেছে। অধিকাংশ মানুষের কাজ নেই। মাফিয়ারা এলাকায় বে-আইনী খাদান চালায়। পেটের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লোকে কাজ করে তাতে, কটা পয়সার জন্য। মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। এলাকার সাধারণ মানুষ স্বীকারও করে না, যদি তাদের চোর বলে ঢুকিয়ে দেয়। গোটা ব্যাপারটার সাথে আর্থ-সামাজিক অবস্থা জড়িত। রাষ্ট্রের মনে হয় এটা পলিসি। কোথাও দুর্ঘটনা ঘটলে গিয়ে বলছে আর হবে না, আমরা বুজিয়ে দিচ্ছি।

বি. ম. ঃ ডিসেরগড় এলাকার অবস্থা?

ডঃ ঘোষ ঃ ইসিএল-এর ওখানে হেড কোয়ার্টার। ওই কাছে সাঁকতোরিয়ায় সেটাই ধসে গেল। আমরা দেখতে গেলাম। দেখলাম ধস বন্ধ করার জন্য স্যান্ড প্যাকিং চলছে। সবাই নিরুত্তাপ। স্যান্ড প্যাকিং পদ্ধতির যিনি প্রবক্তা তারও এটার উপর পুরো ভরসা ছিল না। এটা একটা টেম্পরারি এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার। এখনও সব জায়গায় স্যান্ড প্যাকিং করেই সব সমস্যার সমাধান হবে বলা হচ্ছে। এটা স্থায়ী সমাধান নয়। খোদ জিএম-এর বাংলোটাই ধসে গেল। এখনও এভাবেই চলছে।

সামডি অঞ্চলের পাহাড় বলে একটা জায়গা আছে। পুরো অঞ্চলটাই ধস কবলিত। কাজোরায় এখনও ধোঁয়া দেখা যায়। পান্ডবেশ্বরের বাঙালপাড়ায় এখন পুনর্বাসনের কথা চলছে।

বি. ম. ঃ এ ডি ডি এ তো পুর্নবাসনসহ গোটা প্যাকেজের দায়িত্বে। তাদের ভূমিকা কী?

ডঃ ঘোষ ঃ এখানে ওদের একটা অফিস আছে। আগে চালাত সি পি এম, এখন তৃণমূল। ঘুসের আড্ডা। কোন কাজ হয়নি। বরাকর, ডিসেরগড়, কুলটি, কাজোয়া, সামডি...কোথাও কাজ হয়নি। পুর্নবাসনের জন্য আদপে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। প্রাইভেট আমলে ক্রিমিনাল মাইনিং হয়েছে এখনও তাই হচ্ছে। আইনত বে-আইনী কাজ হচ্ছে।

বি. ম. ঃ ওপেন কাস্ট মাইনিং নিয়ে আপনার মত কী?

ডঃ ঘোষ ঃ এটা খুব ক্ষতি করছে। গ্রামে কৃষি উঠে যাচ্ছে। জলের সোর্স নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওরা বলছে খোঁড়ার পর জমানো পাথর (ওভারবার্ডেন) দিয়ে গর্ত বন্ধ করে দেবে কিন্তু করছে না। ওপেন কাস্ট মাইনিং এর জন্য খনির বাইরে অনেক জমি নষ্ট হচ্ছে। পুকুর, কুয়ো শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার মতে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনস্ বেটার। বিদেশে কয়লা মাটির অনেক গভীরে। আমাদের এখানে সারফেসের কাছে। পিলারগুলো ছোট করছে, তুলে কয়লা নিয়ে যাচ্ছে। বালি দিয়ে ভর্ত্তির কথা বলছে। দিচ্ছে না। বালি সাপ্লাই করে কতলোক কোটিপতি হয়ে গেল। বালি দিয়ে পিলারের মত সাপোর্ট হচ্ছে না। কয়লা কাটার কোন নিয়ম মানে না।

বি. ম. ঃ আউটর্সোসিং?

ডঃ ঘোষ ঃ আউটসোসিং দুর্ঘটনা বাড়াচ্ছে। আগে নিয়ম ছিল আন্ডারগ্রাউন্ডে ঠিকা শ্রমিক নামবে না। এখন হচ্ছে। দুর্ঘটনা ঘটছে। এগুলো রেকর্ড হয় না। পরিবারের লোককে ডেকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের বদলে ২০ হাজার টাকা দিয়ে বলছে তোদের তো জব কার্ড নেই, কেস করলে কিছুই পাবি না। এই টাকা নিয়ে নে। সুরক্ষা বলে এখানে কিছু নেই। কোন পে-স্ট্রাকচার নেই। সাধারণ মানুষ কাজ না থাকায় জেনে বুঝেই এই কাজ করছে।

বি. ম. ঃ আপনাকে মূল্যবান বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

ডঃ ঘোষ ঃ ধন্যবাদের কিছু নেই। আপনারা সমস্যাটা তুলে ধরুন। 'অধিকার' সংগঠন, আসানসোল সিভিল রাইটস্ এটা তুলে ধরে। সকলে মিলে বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যাটা

হাইলাইট করা ভাল।

শ্রমিক নেতা তথা কোলিয়ারী শ্রমিক সুজিত মাঝি

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ আমরা একটা বিজ্ঞান সংগঠন বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে কোলিয়ারী অঞ্চলের ধস, আগুন থেকে প্রতিকার এবং খনি দুর্ঘটনা নিয়ে জানতে এসেছি।

সুজিত মাঝি ঃ এখানে ১৩৯ টা মৌজা ধস এবং আগুন প্রবণ, হারাধন রায়ের বইতে আছে। যে সব জায়গায় শিফ্‌ট করার কথা বলেছে পান্ডবেশ্বরের বাঙালপাড়া ছাড়া কোথাও হয়নি, কোথাও কোথাও স্যান্ড প্যাকিং করেছে। আগে যে কয়লা তুলতো প্রাইভেট কোম্পানীগুলি তারা কোন ম্যাপ রাখেন নি ফলে বিশাল সমস্যা। বহু জায়গায় ধস নামছে, আগুণ জ্বলছে। বরাকরের অবস্থা মারাত্মক। আমি একটা ধস দেখতে গেছিলাম। গর্ত হয়ে গেছে। দু ট্রাক শুকনো বালি চলে গেল। তারপর জল দিয়ে বালি ঢোকালো। এর দায়িত্ব তো ইসিএল নেবে না, তবুও ট্রেড ইউনিয়ন থেকে আমরা দাবী করছি।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ শুনেছি এলাকার মানুষ ধস-আগুন দেখেও এলাকা ছেড়ে যায় না?

সুজিত মাঝি ঃ কারণ বিকল্প বাসস্থান দেয়নি। শুধু বাসস্থান দিলে হবে না, কাজ দিতে হবে। এসব না দিলে যাবে না। প্রচন্ড ধসপ্রবণ এলাকা বরাকরে আড়াই লক্ষ টাকা কাঠা জমি বিক্রি হচ্ছে। এই এলাকায় থাকলে কাজ মিলবে, তাই লোকে যায় না।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ টাউনশিপ গড়ার কথা হয়েছিল, কাজ শুরু হয়েছে?

সুজিত মাঝি ঃ না, কাজ এগোয় নি।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ আপনি তো কোলিয়ারী ওর্য়াকার, শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এখানে কোন পদ্ধতিতে মাইনিং হচ্ছে?

সুজিত মাঝি ঃ বোর্ড এন্ড পিলার মেথড, ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতি।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ লঙ ওয়াল পদ্ধতি বা অন্য মেথড লাগু হয়নি?

সুজিত মাঝি ঃ একসময় লঙ ওয়াল পদ্ধতি লাগু হয়েছিল। এতে প্রোডাকশন বেড়েছিল খুব। কিন্তু কোলিয়ারীটা নষ্ট হয়ে গেল। তাছাড়া মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে বিদেশের বাতিল মেশিনগুলো আনা হত। তাছাড়া এই পদ্ধতি লাগু করতে গেলে শক্ত লেয়ার দরকার।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ আগে নাকি পিলারগুলো সরু করে ফেলা হত লোভে, এখন কি হয়?

সুজিত মাঝি ঃ এখনও তাই। উৎপাদন বাড়ানো জন্য পিলার সরু করে ফেলেছে। তাই অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনস্‌-এ সেফটির ব্যাপারটা কেমন আছে? সেফটির দিক থেকে আন্ডার গ্রাউন্ড ভাল না ওপেন কাস্ট?

সুজিত মাঝি ঃ ওপেন কাস্ট (ও সি পি)

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ ওপেন কাস্টেও তো দুর্ঘটনা ঘটে ...

সুজিত মাঝি ঃ সেটা হচ্ছে কাজের ভুলে।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ ও সি পি র জন্য তো অঞ্চলের water level নেমে যাচ্ছে....

সুজিত মাঝি ঃ সে তো হবেই। নিয়ম জনবসতি থেকে দূরে খনন করা। এখানে খনিগুলো সব জনবসতির মধ্যে।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ ও সি পি তে বেশী আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে বলা হয় এটা কি ঠিক?

সুজিত মাঝি ঃ ও সি পি তে কয়লা কেটে স্টক করে রাখা যাবে না। কয়লা কাটার পর খোলা হাওয়ায় রাখলে নিজে থেকে জ্বলন শুরু হয় অক্সিজেন পেয়ে। স্টক জলদি সরিয়ে ফেলতে হয়। আন্ডার গ্রাউন্ডে এ সমস্যা কম।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ এখানে সেফটির নিয়ম কতটা মানা হয়? সেফটি কমিটি কেমন কাজ করে?

সুজিত মাঝি ঃ ১০ পারসেন্টও করে না। শ্রমিকের জীবন ওপরওয়ালার হাতে। বহু খনিতে হিট বেশী, কোথাও ভেন্টিলেশন ঠিক নেই, চাল নড়বড়ে হয়ে আছে। যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ ডি জি এম এস কি করে?

সুজিত মাঝি ঃ ডি জি এম এস ঘুসের আড্ডা। মাঝে মাঝে এসে এক-একটা মাইনস বন্ধ করে দেয়, আবার টাকা পয়সা দিলেই খুলে দেয়।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ নিরসার বাসন্তীমাতায় তো ডি জি এম এস মাইনসটা বন্ধ রেখেছিল, তারপর ৬ মাস আগে খুলে দিল কেন?

সুজিত মাঝি ঃ হ্যাঁ, তাই করেছে। ওখানকার ম্যানেজার অরূপ চট্টোপাধ্যায় মাইনস্‌ এর সমস্যা ভাল বুঝত, শ্রমিকদের সাথে সম্পর্কও ভাল ছিল। শ্রমিকরা ওনাকে জানাতে নিজে গিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখছিল। ওঁর সাথে যারা মারা গেল তাঁরাও দক্ষ লোক। অরূপ দক্ষ লোক, ওঁর ব্যাপারে জি এম ঠিক

মন্তব্য করেনি।

বি. ম ঃ হ্যাঁ বলেছে 'এরর অফ জাজমেন্ট'...

সুজিত মাঝি ঃ তোমরা তো নামই না খনিতে। বছরে একবার নাম কা ওয়াস্তে...

বি. ম ঃ এরকম তো বহুদিন চলছে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা কি?

সুজিত মাঝি ঃ বলতে দ্বিধা নেই, সঠিক নয়। আমাদের ইউনিয়ন সিটু-রও পচন ধরেছে। অধিকাংশ নেতা সুদের কারবারের সাথে যুক্ত, তারমধ্যে আমাদেরও আছে। আমি বাধা দেওয়ায় দশ লাখ টাকা অফার করেছিল। একসময় সিটুর ভূমিকা ভাল ছিল।

বি. ম ঃ সেফটি কমিটি?

সুজিত মাঝি ঃ ওকে তো লোকে বলে 'সিঙাড়া কমিটি'। ওর কাজ গল্পগুজব করে ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত লাগু করা। আন্ডার গ্রাউন্ডে সেফটির খুব প্রয়োজন। এখানে পাথর টেস্ট না করে ব্লাস্টিং করে, পিলারগুলো প্রশস্থ রাখা হয় না, টিম্বারগুলো ঠিক সময় পাল্টানো হয় না, ডিপিলারিং এর সময় সবচেয়ে বেশী সেফটি দরকার। যেখান থেকে নামছে সেখান থেকেই পিলার কাটছে। ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটছে।

বি. ম ঃ ই সি এল-এ কত শ্রমিক আছেন?

সুজিত মাঝি ঃ একসময় ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার আর এখন ৭০ হাজার। এখন আউটর্সোসিং বেশী হচ্ছে। হারাধন রায় এর বিরোধী ছিলেন, তখন পার্টির সাথে তাঁর বিরোধ হয়। মাটি তোলা, কয়লা কাটা সবই আউট র্সোসিং হচ্ছে। ঠিকা শ্রমিকরা কম বেতনে কাজ করছে। এখানে শ্রমিকদের উপর শোষণ হয় সবচেয়ে বেশী। তাদের কোন নিরাপত্তা নেই।

বি. ম ঃ এখানে এসার ওয়েল এবং গ্রেট ইস্টার্ন কর্পোরেশন লিমিটেড তো মিথেন তুলছে। মিথেন তোলার সময় তার সাথে ওঠা বিষাক্ত জল শোধন করছে না বলে অভিযোগ শোনা যায় ...

সুজিত মাঝি ঃ শুনেছি মিথেন তুলছে। আমার এ বিষয়টা জানা নেই।

বি. ম ঃ এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ কি?

সুজিত মাঝি ঃ কোন পজিটিভ স্টেপ নিতে গেলে তা বামেদেরই করতে হবে। লাগাতার আন্দোলনের দরকার। আন্দোলন ছেড়ে দিলে আগামী দিনে কোলিয়ারী শ্রমিকদের কোন অধিকার থাকবে কি না বলা যায় না।

[উনি নেতৃত্বের অনুমতি না থাকায় ছবি তোলায় আপত্তি করেন তাই আমরা ছবি তুলি নি।]

ইসিএল এর অভিজ্ঞ সার্ভেয়ার শ্রী কৌশিক হালদার

সার্ভেয়ার শ্রী কৌশিক হালদার

বি. ম ঃ আমরা একটা বিজ্ঞান সংগঠন থেকে খনি দুর্ঘটনা এবং অঞ্চলের স্থিতিশীলতা প্রসঙ্গে জানতে এসেছি। খনিগুলিতে সেফটির বন্দোবস্ত কেমন?

কৌশিক হালদার ঃ সমগ্র এলাকায় একটা র‍্যাকেট আছে, তারা চায় না প্রপার ওয়েতে কাজ হোক। এখানে সঠিক পদ্ধতিতে মাইনিং হয় না, ঠিকভাবে স্যান্ড প্যাকিং হয় না।

বি. ম ঃ এখন তো জিওফিজিক্যাল পদ্ধতি প্রয়োগ করেই ভয়েড আছে কি না জানা যায়।

কৌশিক হালদার ঃ ওসব তো দূর। একটা উদাহরণ দেই। একটা খনিতে ৬% মিথেন পাওয়া যায় বলে জানাই, ক'দিন কাজ বন্ধ করে। আবার চালু করতে চায়। আবার বাধা দেই। তখন অন্য পুরানো রুটে শ্রমিকদের নামতে বলে। ওই পথটা বহুদিন বন্ধ ছিল, জল জমে আছে, সাপের বাসা হয়ে আছে। বিষাক্ত সব সাপ। জোর করে নামানোর জন্য চাপ দেয়।

বি. ম ঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা ইনোভেটিভ কিছু করেন না?

কৌশিক হালদার ঃ এখানে ইনোভেটিভ কিছু করা যায় না। বলা হয় বিজ্ঞান মেনে চললে কাজ চালানো যাবে না। ২০-২৫ ফুটের বদলে ৫-৬-৯ ফুট পিলার। প্রোডাকশন বাড়াবার জন্য পিলার ছোট করা হচ্ছে, পিলারের মাঝখান থেকে কয়লা কাটছে...ভাবতে পারেন!

বি. ম ঃ বোর্ড এন্ড পিলার ছাড়া অন্য আধুনিক পদ্ধতি লাগু হয় না?

কৌশিক হালদার ঃ লঙ ওয়াল চালু হয়েছিল। ৪ টা মেশিন চলেছিল, প্রোডাকশন ৪ হাজার টন প্রতিদিন প্রতি মেশিনে।

হঠাৎ দেওয়াল কেটে ফেলল, জল ঢুকে গেল। ৪ টের মধ্যে ২ টো এখন জলের তলায় পচছে, অন্যগুলো চালানো বন্ধ।

বি. ম ঃ আপনারা সার্ভে করেন কোন যন্ত্রে?

কৌশিক হালদার ঃ আমরা এখনও টেপ দিয়ে ১সেকেন্ড থিওডোলাইট যন্ত্রের সাহায্যে সার্ভে করি। আমি আধুনিক যন্ত্র টোটাল স্টেশন (টি এস) চেয়েছিলাম। ওরা বলল ওতে ব্যাটারি ব্যবহার হয় তাই চলবে না। এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। অথচ আপনারা জানেন খনিতে বিশেষতঃ আন্ডার গ্রাউন্ড মাইনস্-এ ঠিকমত সার্ভে করা কত গুরুত্বপূর্ণ। ওরা এই কাজের গুরুত্বই বোঝে না। এখানে খনিগুলোর মধ্যে কোন সীমানা নির্দিষ্ট নেই। সকলেই কাটতে কাটতে এগিয়ে চলেছে। আন্ডারগ্রাউন্ডের ম্যাপ সঠিক না থাকলে ভীষণ সমস্যা। একটা জায়গায় গিয়ে থামাতে বলায় ২০০ মিটার পারটিশন রেখে ছেড়ে দেওয়া হল। যে কোন সময় টিল্ট করলে বিপদ ঘটবে।

বি. ম ঃ সেফটি কমিটির ভূমিকা?

কৌশিক হালদার ঃ সেফটি কমিটির লোক খাদানে যায় না, ঘরে বসে রিপোর্ট লেখে। বেশীরভাগ খনি অনেকদূর বিস্তৃত হয়ে গেছে, মাটির নীচে টানেল গেছে ৪-৫ কি. মি পর্যন্ত। ওসব জায়গায় ভেন্টিলেশন প্রায় নেই, প্রচন্ড গরম। এস ডি এল মেসিন যেটা লোড করে তার সাথে চেইন কনভেয়ার বেল্ট দিতে হয়, তা দেয় না।

বি. ম ঃ আগুনের সমস্যা?

কৌশিক হালদার ঃ নিমচা কোলিয়ারীর নিগা- তে আগুন লেগেছে। বহু জায়গায় এমন রিপোর্ট আছে। এর জন্য স্যান্ড প্যাকিং, সিমেন্ট দেওয়া দরকার সঠিক পরিমাণে।

বি. ম ঃ পলিইউরেন ফোম যেটা বিদেশে ব্যবহার করা হয়, এখানে হয় কি?

কৌশিক হালদার ঃ না, এমন কিছু জানি না।

বি. ম ঃ জিওফিজিক্যাল টেস্টিং করা হয়?

কৌশিক হালদার ঃ প্রয়োজন হলে করা হয়। মজার ব্যাপার – একটা খনিতে সি এম আর আই - কে দিয়ে স্টাডি রিপোর্ট বানানো হল। রিপোর্ট এল - তাতে প্রচুর সাজেশন ছিল। মাইসনে তা মানা হল না। তাহলে সি এম আর আই কে দিয়ে খামোখা রিপোর্ট বানানোর দরকারটা কী? এরকমই চলে।

বি. ম ঃ ও সি পি - র সুবিধা / অসুবিধা কি আছে?

কৌশিক হালদার ঃ ওটা আমি ঠিক জানি না।

বি. ম ঃ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের বিষয়টা, বিশেষত কাজের সময়?

কৌশিক হালদার ঃ খনি মুখ থেকে ৫ কি. মি দূরে মাটির নীচে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আনার কোন ব্যবস্থা নেই। হাঁটিয়ে বা ট্রেচারে অথবা কয়লার টাবে বসিয়ে আনা হয়। তাড়াতাড়ি আনলে হয়ত লোকটা বেঁচে যেত, দেরী হওয়ায় অনেককে বাঁচানো যায় না। একজন অসুস্থ হওয়ায় তাকে ভেলোরে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে ডাক্তার লিখে দিল ওই শ্রমিক নীচু হয়ে কাজ করতে বা মাল বইতে পারবেন না। এখানে রিপোর্ট আসার পর তা মানা হল না। মাইনস্ থেকে এখানকার ডাক্তারকে দিয়ে ফিট সার্টিফিকেট লিখিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। খনির নীচের শ্রমিকদের কোন বিশ্রামের ব্যবস্থা নেই, ল্যাট্রিন নেই। বেশীরভাগ মাইনস্-এর ঢোকার মুখে একটা করে মন্দির। খনিতে নামার আগে সকলে প্রণাম করে ঢোকে ভগবানের ভরসায়। বড় বড় অফিসাররাও তাই করে। একবার বড় অফিসারদের সাথে নীচে নামার সময় কালী মূর্তিকে সবাই প্রণাম করল। আমি না করায় এক কর্ত্তা প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম ওই কালীমূর্ত্তির পাশে একটা পিতলের ঘট ছিল। ক'দিন আগে কারা সেটা চুরি করে নিয়ে গেছে। যে ঠাকুর নিজের ঘট চোরের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না সে আমায় বাঁচাবে কি ভাবে!

বি. ম ঃ আমরা তো শুধু নেগেটিভ দিকটাই আলোচনা করছি। পজিটিভ ভাবনা করার কি কিছুই নেই?

কৌশিক হালদার ঃ যখন আমরা খনিতে একসাথে কাজ করি তখন উঁচু জাত, নীচু জাত, হিন্দু-মুসলমান কেউ দেখে না। বাইরে এলেই সমস্যা। এখানকার অধিকাংশ শ্রমিকরা ডেথ কোটায় চাকরি পান বা সোর্সে, শিক্ষা কম। অভিজ্ঞতা থেকে ওরা শেখে, বিজ্ঞান জানে না। আমাদের ওদের বিজ্ঞানটাও শেখাতে হবে। সমাজে একটা চালু কথা আছে – শিক্ষিত মানুষ গতরে খাটার কাজ করবে না আর অশিক্ষিত মানুষদের শেখার কোন দরকার নেই। এই ভাবনাটা বদলাতে হবে। ভুল কাজগুলো সকলে করছে কারণ সিস্টেমে এটাই করতে শেখানো হয়। আমার মনে হয় কাউকে কাউকে এগিয়ে এসে ভূমিকা নিতে হবে। অনেক শ্রমিক শিখতে চায়, তাদেরও শেখাতে হবে। শুধু শ্রমিক নয় সাধারণ মানুষকেও সচেতন করতে হবে। এই কাজে 'অধিকার' সংগঠন ভাল কাজ করছে। ওরা একটা বই, সি ডি প্রকাশ করেছে। সমস্যা সমাধানের জন্য একটা চাপ রাখা দরকার। এখন কোলিয়ারীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করছে। এবং যখন কাজে আসবে ভাল হবে।

বি. ম ঃ সমগ্র এলাকায় ধস, আগুন–পুনর্বাসন এসব নিয়ে কিছু বলুন।

কৌশিক হালদার ঃ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সঠিক পুর্নবাসন এবং কাজের ব্যবস্থা না হলে মানুষ যাবে না। আগে সব ব্যবস্থা করার পর তাদের জোর করলে তবে যাবে। সমগ্র পরিকল্পনা রূপায়ণ করাটা বিরাট ব্যাপার। বর্তমান পরিস্থিতি বজায় থাকলে কিছু হবে না।

বি. ম ঃ মূল্যবান মতামতের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

কৌশিক হালদার ঃ আপনাদের সাথে কথা বলে ভাল লাগল, ধন্যবাদ।

ধেমো মেইন এবং নরসুমুদা খনি শ্রমিকদের সাথে কথাবার্তা

ধেমো মেইন খনির শ্রমিকরা

নরসুমুদা খনির শ্রমিকরা

আমাদের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টীম গত ১৬ই নভেম্বর ধেমো মেইন এবং নরসুমুদা খনি শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন। **ধেমো** মাইনস্ এর ম্যানেজার বিতর্কিত বিষয়গুলি এড়িয়ে বললেন সব কিছু ঠিকাঠাক চলছে। শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা গেল এই খনিতে মানুষ এবং মাল ওঠানামার জন্য যে ব্যবস্থা আছে তার মেটাল রোপ পুরানো হয়ে গেছে, তার এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে গেছে। দড়ি ছিঁড়ে বিপদ ঘটতে পারে বলে শ্রমিকরা প্রতিবাদ করেছেন। ক'দিন কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এখনও নতুন দড়ি (রোপ) আসেনি। সাম্প্রতিককালে এখানে চাল পড়ে বা অন্য কোন কারণে দুর্ঘটনা ঘটে নি। তবে নীচে ভেন্টিলেশনের সমস্যা আছে।

নরসুমুদা খনির শ্রমিকরা বললেন ঃ এখানে গুহাগুলি মাটির নীচে বহুদূর চলে গেছে। ৫ কি. মি হেঁটে যাওয়ার পর কাজ শুরু করতে হয়। ভিতরে এক একটা জায়গায় খুব গরম, প্রচুর গ্যাস, হাওয়া পৌঁছায় না। তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২০০৭ সালে এই খনিতে চাল পড়ে একজন মারা গেছেন। হাওয়া চলাচলের সমস্যা নিয়ে অভিযোগ করায় পর্দা দিয়ে দিয়েছে। এতে কোন কাজ হয়নি। সব জায়গায় পিলার ঠিক নেই ইত্যাদি। ■

অনেক পাঠক টেলিফোনে সমীক্ষণ সম্বন্ধে তাঁদের মূল্যবান মতামত জানিয়েছেন। যে পাঠকরা টেলিফোনে মতামত জানাচ্ছেন তাঁদের জানানো হচ্ছে, আপনারা ডাকযোগে অথবা ই-মেলে আপনাদের মতামত পাঠান যাতে আপনাদের মতামত পত্রিকায় প্রকাশের সুযোগ থাকে। এতে পত্রিকার সকল পাঠকই উপকৃত হবেন।

– সম্পাদক, সমীক্ষণ

‘বিজ্ঞান মনস্ক’ পশ্চিমবঙ্গ’র প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল

কর্মীদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ‘বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ’-র প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত সেপ্টেম্বর মাসে। সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ থেকে ২২ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন ইউনিট সম্মেলনগুলি অনষ্ঠিত হওয়ার পর গত ২৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় রাজ্যব্যাপী কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন ইউনিট থেকে আগত প্রতিনিধিরা ছাড়াও ভাতৃপ্রতিম সংগঠন ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন গণআন্দোলন তথা বিজ্ঞান আন্দোলনের সহযোগী অখিল ভারত প্রগতিশীল ছাত্রমঞ্চ, সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটি এবং লাল ঝান্ডা মজদুর ইউনিয়ন (সমন্বয় সমিতি)-র প্রতিনিধিরা।

কেন্দ্রীয় সম্মেলন শুরু হয় মানব সমাজের সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত অগ্রণী মানুষেরা সমাজ ও বিজ্ঞানের বিকাশের স্বার্থে, মানব কল্যাণের স্বার্থে শাসকশ্রেণীর ঘৃণ্য আক্রমণে শহীদ হয়েছেন, কারাগারের অন্তরালে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

এরপর সংগঠনের সম্পাদক সাংগঠনিক ও অনুশীলনের প্রতিবেদন পেশ করেন। বিভিন্ন কর্মী তথা প্রতিনিধিরা এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং আগামী দিনের করণীয় কতর্ব্য সুনির্দিষ্ট করে বিজ্ঞান তথা সামাজিক আন্দোলনকে বিকশিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। দীর্ঘ চর্চায় নানা সংশোধনী ও সংযোজনীসহ প্রতিবেদনটি সম্মেলন গ্রহণ করে।

বিরতির পর সংগঠনের ‘কর্মসূচী ও সংবিধান’ চূড়ান্ত করণের জন্য চর্চা শুরু হয়। উপস্থিত প্রতিনিধিরা নানা ধারালো যুক্তি পেশ করে খসড়া দলিলটির বিভিন্ন দিক নিয়ে চর্চা করেন। দীর্ঘ চর্চার পর বিভিন্ন সংযোজনী, সংশোধনীসহ সংগঠনের কর্মসূচী ও সংবিধান চূড়ান্ত হয়। একটি প্রস্তাবনার ভিত্তিতে দীর্ঘদিনব্যাপী চলা সংগঠন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার আগামীদিনের পথ চলার রাস্তা স্থির করল। এটিই এই সম্মেলনের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাওয়া।

এরপর প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করেন। নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি সংগঠনের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চের প্রতিনিধি বলেন “এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আপনাদের আলোচনা শুনে আমরা সমৃদ্ধ হলাম। এটা আপনাদের প্রথম সম্মেলন, আগামীদিনে অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং আপনারা সমৃদ্ধ হলে আমরাও সমৃদ্ধ হতে পারব। আমাদের প্রস্তাব থাকছে উভয় সংগঠনের মুখপত্রে যদি লেখার আদান প্রদান করা যায় তবে দুই পত্রিকার পাঠকরাই সমৃদ্ধ হবেন। একইভাবে স্লাইড শো, সেমিনারের বিষয়বস্তু এবং জ্ঞানের আদান প্রদান করলে সকলেই উপকৃত হব। আমরা আশা করব সর্বভারতীয় স্তরে অতীতের মত ভবিষ্যতেও আমরা কাজ করব।”

লাল ঝান্ডা মজদুর ইউনিয়ন (সমন্বয় সমিতি)-র প্রতিনিধি বলেন “যে গভীরতা নিয়ে সমস্ত কিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ হল তা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা নেবেন এই আশা রাখি। যে অন্ধকার জীবনে শ্রমজীবী জনতা পড়ে আছে তাদের সামনে আলো দেখাতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে কারণ শ্রমিকশ্রেণী সচেতন না হলে সমাজের মুক্তি ঘটবে না। আপনাদের মুখপত্র শ্রমিকদের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখব।”

এ আই পি এস এফ-এর প্রতিনিধিরা বলেন “যে কর্মসূচী গৃহীত হল তাকে সমর্থন জানাছি, এখানে বিজ্ঞান কী? বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সমাজ বিকাশের সম্পর্ক নিয়ে যা বলা হয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য এবং শিক্ষণীয়। ভবিষ্যতে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে যৌথ ভাবে যোগ দিতে পারব এই আশা রাখি।”

সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধি বলেন “আজকের দিনটি ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে কারণ আজ থেকে অতীতের বিজ্ঞান মনস্ক’-র সাথে আগামী দিনের বিজ্ঞান মনস্ক’-র একটা গুণগত পার্থক্য হয়ে গেল। আমাদের কর্মসূচীর সাথে আপনাদের গৃহীত কর্মসূচীর মূলগত ঐক্য আছে। তাই ভবিষ্যতে যে কোন কর্মসূচীতে আপনারা আমাদের পাবেন এবং আমরাও আপনাদের আশা করব। আজ বিজ্ঞানের সুফল থেকে যে ব্যাপক মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন–তাদের কাছে এর সুফল পৌঁছে দিতে, জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিতে যে গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় আপনারা কাঁধে তুলে নিয়েছেন তার সফলতা কামনা করি। মহান সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছিলেন যে নিজেদের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করুন তবে দেখবেন সাধারণ মানুষ আপনাদের দেখে শিক্ষিত হবে। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে আপনাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।”

এরপর বিভিন্ন প্রতিনিধিরা সম্মেলনে তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং সবশেষে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সমস্ত প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত সংগঠনকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সাংগঠনিক ও অনুশীলনের প্রতিবেদন

[গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৩, প্রথম রাজ্যগত কেন্দ্রীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার পাঠকদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হল।]

সাথী,

'বিজ্ঞান মনস্ক' পশ্চিমবঙ্গ'র প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে আগত সমস্ত প্রতিনিধিদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। দেশে দেশে বিজ্ঞান তথা সামাজিক আন্দোলনের সমস্ত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে প্রতিবেদন শুরু করছি।

বর্তমান পরিস্থিতি ঃ আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দিকে তাকালে চোখে পড়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ। শিল্প বিপ্লবের সমসাময়িক কাল হতে বিজ্ঞানের যে বিকাশ শুরু হয়েছিল আজও তা অব্যাহত। এই বিকাশ সমাজ ও পরিবেশ সম্বন্ধে বিষয়গুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে শিখিয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, রসায়ন ইত্যাদিতে এমন এমন আবিষ্কার হয়েছে বা হয়ে চলেছে যা পূর্বে অসম্ভব বলে মনে হত। উদাহরণস্বরূপ ল্যাবরেটরিতে হিগস বোসন কণার আবিষ্কারের ফলস্বরূপ বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টিতে ঈশ্বর নামক কাল্পনিক শক্তির হাত আছে এই বক্তব্য নাকচ হয়ে গেছে। জীববিজ্ঞানে জেনেটিক তত্ত্বের ধারাবাহিক গবেষণা ও জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ মানুষের শরীরের দূরারোগ্য রোগ সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করেছে, তাকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান পৃথিবীর ভূস্তর ও ভূস্তরের নীচের রহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হয়েছে। ভূমিকম্প, সুনামি-র মত ঘটনার পিছনে ভগবানের হাত রয়েছে এই ভ্রান্ত ধারনাকে নস্যাৎ করে এর বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কার করেছে ও এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে দূর করার ও প্রতিরোধ করার বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি নির্দিষ্ট করেছে ও তা সফলভাবে দূর করার ও প্রতিরোধ করার বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি নির্দিষ্ট করেছে। কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতি ও কৃষিতে ফসলের উৎপাদনশীলতা এমন এক মাত্রায় উন্নীত হয়েছে যে তার বৈজ্ঞানিক বন্টন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক বিকাশ মানুষকে দীর্ঘ-সুস্থ জীবন দান করতে সক্ষম। বর্তমান ও আগামী দিনে শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগানের উপায়গুলি আজ নিউক্লিয় বিজ্ঞানের করায়ত্ত। ফলিত বিজ্ঞানের পাশাপাশি সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও মানুষ আবিষ্কার করেছে। সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে পূর্বের সমস্ত ভাববাদী তত্ত্বকে নাকচ করেছে ও তাকে এক দৃঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। দর্শনের জগতেও ঘটে গেছে এক বিপ্লব।

বিজ্ঞান তার সর্বশক্তি দিয়ে মানুষকে মানুষের মতো বেঁচে থাকাকে নিশ্চিত করলেও, জনজীবনে দেখা যায় ঠিক তার উল্টো ছবি। জনজীবন ছেয়ে আছে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অপুষ্টি-অনাহার, ঈশ্বরবাদ-ধর্মবাদ, কুসংস্কার-অপবিজ্ঞানের কালো অন্ধকারে। FAO জানাচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে ১০০ কোটি মানুষ অনাহারে থাকে, ২০০ কোটি মানুষ থাকেন অর্ধাহারে। ভারতে প্রতিদিন ১৫ কোটির বেশী মানুষ অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটান। হিসাব দেখাচ্ছে পৃথিবীর জনসংখ্যার মোট চাহিদার ৪৬% বেশী খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়। দেশে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকেন অনেক মানুষ অথচ ভারতে মাথাপিছু উদ্বৃত্ত হয় প্রায় ৪১ কেজি খাদ্য শস্য। এই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য দেশের অভুক্ত মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেবার স্বাভাবিক দাবীকে সম্প্রতি নস্যাত করে দিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, আর দেশের সর্বোচ্চ আদালত তাতে সরকারী শীলমোহর লাগিয়েছে। সম্প্রতি খাদ্য সুরক্ষা আইন সংসদে গৃহীত হয়েছে, এই আইন মানুষকে খাদ্যে নিরাপত্তা দেবে না কারণ মাত্র ৩ বছরের জন্য সরকার নির্ধারিত বি পি এল-রা এই সুযোগ পাবেন। এরপর তা বন্ধ হয়ে সরকার কৃষকদের কাছ থেকে যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে খাদ্যশষ্য ক্রয় করে সেই দামে খাদ্য কিনতে হবে। জনস্বাস্থ্যের নগ্ন ছবি ফুটে ওঠে যখন দেখা যায় ভারতে প্রতি বছর ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয় জলবাহিত রোগে।

শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় পাঠ্যসূচীতে ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলির পঠন পাঠন চলছে অবাধে। উচ্চশিক্ষায় জ্যোতিষ শাস্ত্র'র মতো অবৈজ্ঞানিক বিষয়টিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। ভূউষ্ণায়নের পিছনে যথার্থ কারণগুলি গবেষণার মাধ্যমে খুঁজে বের করার বদলে বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রচার চালানো হচ্ছে। পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণের অনুসন্ধান না করে

এক তরফাভাবে মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিভিন্ন আবিষ্কার ও অগ্রগতির পিছনে সাধারণ মানুষের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হচ্ছে ও অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্বার্থে তা মানুষের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় মদতে ঈশ্বরবাদ, ধর্মবাদ, কুসংস্কার, জ্যোতিষবাদ অপবিজ্ঞান ইত্যাদিকে টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন রাষ্ট্রকে অসহনীয় করে তুলছে। সাম্প্রতিক মহারাষ্ট্রের যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মী নরেন্দ্র দাভোলকরের হত্যা রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকেই তুলে ধরে। শুধু তাই নয় সমাজ আজ এক দারুন অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নারী নির্যাতন এবং মহিলাদের প্রতি অবমাননা বেড়ে চলছে, যুবসমাজের মধ্যে র‍্যাগিং করা, নেশার প্রচলন বৃদ্ধি, অশ্লীল সংস্কৃতির প্রচার বাড়ছে। এমতাবস্থায় প্রতিটি সঠিক বিজ্ঞান আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনে পর্যবষিত হয়েছে। এমনই এক বিশেষ পরিস্থিতিতে 'বিজ্ঞান মনস্ক' তার প্রথম সম্মেলন সংগঠিত করেছে। এই সম্মেলন তাই বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

সমাজে ঘটে চলা ঘটনাগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস বহুদিন ধরেই বহু বিজ্ঞান সংগঠন নিয়ে আসছে। এদের মধ্যে কোন কোন সংগঠন সমাজে বিরাজমান অবৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলিকে সঠিকভাবে নিরুপণে সক্ষম হয়েছিল এবং এর সামাজিক উৎসগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তাকে নির্মূল করার কথা বলেছিল। কিন্তু বর্তমানে সে সব বিজ্ঞান সংগঠনগুলি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে তাদের প্রধান ঝোঁক হল সংস্কারবাদী অর্থাৎ সমস্যার মূল উৎসগুলিকে নিরসন না করে কেবল মাত্র সংস্কারের মাধ্যমেই সমস্যাকে দূর করা যাবে এই নীতির ভিত্তিতে কাজ করা। ফলে, বিজ্ঞান আন্দোলন একটি জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সংস্কারবাদী ঝোঁক পরিত্যাগ করে বিজ্ঞান সংগঠনগুলিকে সমাজের মধ্যে কুসংস্কার-ধর্মবাদ-ঈশ্বরবাদ ইত্যাদি টিঁকে থাকার কারণগুলিকে নির্মূল করতে হবে।

এমনই এক পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ তার প্রথম রাজ্যব্যাপী কেন্দ্রীয় সম্মেলন আয়োজন করেছে। এই সম্মেলন হতে সঠিক কর্মসূচী সংবিধান নিরূপন করে সেটি অনুশীলনে নিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করার কাজটি তাই অত্যন্ত জরুরী।

বিজ্ঞান মনস্ক'র সৃষ্টি ও তার বিকাশ ঃ ১৯৯২ সালে দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার একটি অঞ্চলে জনা কয়েক উৎসাহী কর্মীর উদ্যোগে 'বিজ্ঞান মনস্ক'র জন্ম হয়। সাধারণভাবে কিছু বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে সমাজে ঘটে চলা বিভিন্ন কুসংস্কার মূলক ও অবৈজ্ঞানিক ঘটনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করার সামান্য প্রয়াস রাখা হত। ১৯৯২ হতে ১৯৯৫ পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চলে এবং পরবর্তীকালে মূলতঃ কর্মীর অভাবেই সাময়িকভাবে 'বিজ্ঞান মনস্ক'র সক্রিয়তা স্তব্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন পরে ৭ই জুন ২০০৯ কলকাতার ঐ অঞ্চলেই উৎসাহীরা একটি সেমিনার-এর আয়োজন করেন। আলোচনার বিষয় ছিল 'পৃথিবীতে প্রাণের উৎস ও জীবের বিবর্তন'। বেশ কিছু স্থানীয় মানুষ ঐ সেমিনারে উপস্থিত হন এবং কর্মীদের মধ্যে কিছু করার উৎসাহ জাগে। একই রকম উদ্যোগ ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৯ দক্ষিণ ২৪ পরগণার একটি অঞ্চলেও নেওয়া হয় এবং ঐ একই বিষয়ের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ও ব্যাপক সাড়া মেলে। এই দুই অঞ্চলের সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে আলোচনার সাপেক্ষে একই সাথে মানুষের মধ্যে কাজ করার একটি প্রস্তাবনা তৈরী হয় এবং 'বিজ্ঞান মনস্ক'র অধীনে থেকে অনুশীলন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'বিজ্ঞান মনস্ক'র নব জন্ম হয়।

বিগত ৪ বছর সংগঠন তার শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে কলকাতা শহর এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কুসংস্কার বিরোধী এবং বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধিকারী অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে নানা অঞ্চলে করেছে। বিভিন্ন এলাকায় 'জলসংকট,' 'জনসংখ্যা কি বেকার সমস্যার কারণ', 'সাপ নিয়ে আতঙ্ক এবং তা থেকে মুক্তি', 'ভূমিকম্পের কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়', 'খাদ্যে ভেজাল', 'আর্সেনিক সমস্যা ও তার প্রতিকার', 'ডেঙ্গু কি ও কেন', 'জন্ডিস কি এবং তার প্রতিকার', 'জীবের সৃষ্টি ও মানুষের বিবর্তন', 'বিশ্ব উষ্ণায়ণ কি মনুষ্যজনিত না প্রাকৃতিক', 'নদীবাঁধ পরিকল্পনা ও বন্যা', ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে নিয়মিত সেমিনার ও প্রচারমূলক অনুষ্ঠান করেছে। প্রতিবছর ২টি অঞ্চলে নিয়মিত বার্ষিক সচেতনতাবৃদ্ধিকারী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নানা প্রদর্শনী, নানা সামাজিক বিষয়ের উপর আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।

সংগঠন গণহিস্টিরিয়ার বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার একটি অঞ্চলে পুরসভার সরবরাহকৃত পানীয় জল দ্বারা হেপাটাইটিস সংক্রমণের বিরুদ্ধে লাগাতা প্রচার ও গণ-আন্দোলনে সামিল হয়েছে। সংগঠন নারী নির্যাতনের সামাজিক উৎস চিহ্নিত করে এর উৎস নির্মূল করার লক্ষ্যে প্রচার আন্দোলন-মিছিল সংগঠিত করেছে। বাংলাদেশের

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিজ্ঞান ও সামাজিক সংগঠনের সাথে যৌথ মিছিল করেছে। দঃ ২৪ পরগণায় পুকুরে স্নান করে ক্যানসার সহ নানা রোগ নির্মূল হয় এই প্রচারের বিরুদ্ধে, 'ভূতে ধরা মেয়েকে ভূত ছাড়াতে', একটি নাসিং হোমে অবৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থে ভুল চিকিৎসায় গর্ভজাত শিশুর মৃত্যুর তদন্ত করে তা ফাঁস করেছে। সংগঠন পশ্চিম মেদিনীপুরে ডাইনী সন্দেহে নিরীহ আদিবাসী মহিলাদের পিটিয়ে মারার তদন্ত অনুসন্ধান করার জন্য ছুটে গেছে। পুরুলিয়া জেলায় শহীদ ভগৎ সিং-র জন্মদিনে তাঁকে নিয়ে স্লাইড শো করে জনমানসে তাঁর আদর্শ তুলে ধরেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে অংশ নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিই সমাজের অন্ধকার দূর করতে পারে এই মতামত তুলে ধরেছে। জনগণের উপর রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নজরদারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বইমেলায় অংশ নিয়েছে। স্কুল-কলেজে সমীক্ষণের নিয়মিত প্রচার চালিয়েছে এবং নানা বিজ্ঞান ও সামাজিক সংগঠনের ডাকে অংশ নিয়েছে।

রাজ্যের বাইরে ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চের ডাকে ভূমিকম্প বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রেখেছে এবং তাদের সম্মেলনে অংশ নিয়েছে।

সমীক্ষণ প্রসঙ্গে ঃ গত ২০১১-এর জানুয়ারীতে সমীক্ষণের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বিগত ৩ বছরের মধ্যে বর্তমান বছর ছাড়া প্রতিবছরই ৪টি করে সংখ্যা প্রকশ করা গেছে। এবছর একটি যৌথ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

সমীক্ষণের প্রচার বৃদ্ধি এর ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা প্রকাশ করে। প্রাথমিক পর্বে অর্থের সংকট থাকলেও বিক্রি বাড়ায় সেই সংকট নাই। আমরা ২ জন ভারতীয় বিজ্ঞানীর মূল্যায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি খাদ্য সমস্যার কারণ, খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল, সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি, পরিবেশ ভাবনার স্বরূপ ও সমাধান, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণ, প্রাণের উৎস সন্ধানে, মানুষের বিবর্তন, সলিল চৌধুরী ও সঙ্গীত ভাবনা, জন্ডিস ও হেপাটাইটিসের স্বরূপ ও প্রতিকার, ডেঙ্গু কী ও কেন, ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক সমস্যা ও তার সমাধান, হিগস বোসন সাব অ্যাটমিক কণা, জ্যোতিষ বনাম জ্যোতির্বিজ্ঞান, নারী নির্যাতনের কারণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছি যা সমাজে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। আমরা প্রচুর সমর্থন যেমন পেয়েছি তেমনই বিরোধিতা ও কুৎসার মোকাবিলাও করতে হয়েছে। শেষ চারটি সংখ্যায় বিভিন্ন ডাক্তার ও বিজ্ঞানীর কাছে নেওয়া সাক্ষাৎকার পত্রিকার মানবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও বিজ্ঞান শীর্ষক ধারাবাহিক রচনা আমরা কিছু দূর প্রকাশ করার পর (পাঠকমহলে সাড়া পড়া সত্ত্বেও) বন্ধ করতে হয়েছে জ্ঞান ও চর্চার অভাবে। সিদ্ধান্ত নিলেও আমরা জিনপ্রযুক্তি খাদ্য, জৈব-অজৈব সার নিয়ে বিতর্ক, পরমাণু শক্তির ব্যবহার প্রশ্ন প্রভৃতি বিষয় রচনা প্রস্তুত করে উঠতে পারিনি।

বর্তমানে সমীক্ষণ রাজ্যের ১০টি জেলায় একটি বড় অংশের পাঠকদের মধ্যে নিয়মিত বিক্রি হয়। রাজ্যের বাইরে ত্রিপুরা এবং ঝাড়খন্ডেও এর নিয়মিত পাঠক আছেন। এছাড়া রাজ্যের অন্যান্য আরও ৩টি জেলাতেও কিছু পাঠক আছেন। এই পাঠকরা চিঠিপত্র কম পাঠালেও টেলিফোনে যোগাযোগ করেন।

বর্তমানে এতবড় রাজ্যের মাত্র কয়েকটি বিন্দুতে আমাদের সংগঠন আছে এবং তার চেতনাগত মানও বিকশিত নয়। তবে বিভিন্ন জেলার উৎসাহী ও নিয়মিত পাঠকদের মধ্য থেকে সংগঠন বিকাশের সম্ভাবনা আছে।

অন্যান্য বিজ্ঞান সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ ঃ বর্তমানে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বিজ্ঞান সংগঠন রয়েছে এদের মধ্যে বেশ কিছু সংগঠন সক্রিয়, মানুষের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এবং কিছু কাজ করার বাসনা রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন কর্মসূচীতে এদের সাথে মতামত বিনিময়ের কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞান মনস্ক'র বিশ্লেষণ এই সংগঠনগুলির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে একই ইস্যুতে বিভিন্ন সংগঠন নিজের নিজের কর্মসূচী নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে অনুষ্ঠান করছে। এই শক্তিগুলিকে সংগঠিত করে সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদেরই ভূমিকা পালন করতে হবে।

সংগঠনের ব্যর্থতা ঃ সমাজের ঘটে চলা বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর সংগঠন যেমন তার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। তেমনি অনেক বিষয়ের উপর সংগঠন তার বিশ্লেষণ প্রস্তুত করতে পারেনি যেমন, ১) শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা শুরু করেও তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের ঘাটতি থাকার জন্য। ২) নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যবহার ও তার নিরাপত্তা বিষয়ক কোন

বস্তুনিষ্ঠ মতামত গঠন করা যায় নি। ৩) জিন পরিবর্তিত খাদ্য (জি এম ফুড) ৪) জৈব ও অজৈব সার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে আগামীদিনে ভাবনা চিন্তা করা প্রয়োজন এবং সঠিক বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। ৫) পত্রিকার একটি সংখ্যার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। ৩য় বর্ষের ১ ও ২ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হয়। এটি সংগঠনের খামতির দিক। ৬) রাজ্য ব্যাপী সংগঠনের বিস্তার লাভ এখনও ঘটেনি। ৭) রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রতারণার বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ তা জানা থাকা সত্ত্বেও সব জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারছি না শক্তির অভাবে। আগামী দিনে এই ঘাটতি পূরণ করতে হবে। ৮) পত্রিকার ইংরাজী মুদ্রণের দাবী থাকা সত্ত্বেও তা করা সম্ভব হয়নি।

আগামী কর্মসূচী সম্বন্ধে প্রস্তাব ঃ

১) কেন্দ্রীয় কমিটিকে নিয়মিত পাঠকদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জেলায় শাখা সংগঠন গড়ায় প্রাথমিকতা দিতে হবে।

২) রাজ্যে বিভিন্ন বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের সাথে আমাদের গৃহীত নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়ে তোলার ভূমিকা নিতে হবে।

৩) শাসকশ্রেণীর দ্বারা প্রচারিত বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক এবং বর্তমান ব্যবস্থার স্বপক্ষে প্রচার ও বিভ্রান্তিগুলির স্বরূপ উন্মোচন করতে হবে।

৪) বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ শ্রমজীবীদের মধ্যে আমাদের বক্তব্য, মুখপত্র ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে সদস্যকরণের প্রসার ঘটাতে হবে।

৫) বিভিন্ন কর্মসূচীর রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জনসাধারণের মধ্য থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৬) প্রতিটি ইউনিটে নিয়মিত ও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষাশিবিরের আয়োজন করতে হবে।

৭) বছরে অন্ততঃ ১টি ইংরাজী মুখপত্র প্রকাশ করতে হবে।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ
সম্পাদক
বিজ্ঞান মনস্ক পশ্চিমবঙ্গ
২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিতর্ক

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ধর্মের বিরোধী নয় অথচ ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের বিরোধী

সাম্প্রতিক দুর্গাপূজোর সময় দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার শীলপাড়ার উদয়ণ পল্লীতে বুক স্টল আয়োজনের উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ'র ১২৫ নং ওয়ার্ড বিজ্ঞান সভা জনগণের উদ্দেশ্যে একটি প্রচারপত্র বিলি করেছে। এই প্রচারপত্রে তারা জানিয়েছে "আমরা ধর্মের বিরোধী নই, কিন্তু অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের বিরোধী, আপনার আমার প্রিয় সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ শারদোৎসবে সম্প্রীতি, শান্তি ও সুন্দর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার আহবাণ জানিয়ে শীলপাড়া উদয়ণ পল্লীতে বুক স্টল এর আয়োজন করেছে।"

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জ্ঞান উন্মেষের পথে প্রধান বাধা ছিল তাদের মনে গোষ্ঠীপতি বা অগ্রণীদের দ্বারা প্রোথিত এক ধারণা – মহাকাশে দৃশ্যমান জগৎ (স্বর্গলোক) মানুষের আদি বাসস্থান। এই অলৌকিক শক্তিই সব কিছুর নিয়ন্তা এবং সর্বশক্তিমান। সুতরাং ঐ শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা কতর্ব্য। এইসব দেব-দেবীদের তুষ্ঠ করার জন্য পূজা ও বলিদানের সাথে নাচ-গান ছিল তখনকার ধর্মোৎসবের অঙ্গ। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রাকৃতিক ঝড়, তুষারপাত, মহামারিকে রুষ্ট দেবতার প্রকোপ মনে করা হত এবং রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য নানা বিধান দেওয়া হত। তথাকথিত অলৌকিক শক্তিতে তুষ্ট করে স্বার্থসিদ্ধি করার উপায় হিসাবে তথাকথিত আধ্যাত্মিক সিদ্ধ পুরুষদের মন্ত্রশক্তিরূপে ম্যাজিকের আর্বিভাব হয়। সংক্ষেপে এইভাবেই হয়েছিল ধর্মের উদ্ভব। **সারার্থে ধর্মের উদ্ভবের মূলে আছে প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরতা এবং এই শক্তির সামনে অসহায়তা।**

ক্রমে ক্রমে উৎপাদনের বিকাশ, শ্রমবিভাজন, প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং এক পতি-পত্নী পরিবারের উদ্ভবের ফলস্বরূপ

জনগোষ্ঠীভিত্তিক, মাতৃতান্ত্রিক তথা আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙ্গে পরিবারের মালিকাভিত্তিক ও ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক পুরুষতান্ত্রিক তথা শাসক ও শাসিত শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজের আর্বিভাব ঘটে। আবির্ভাব ঘটে শাসকশ্রেণীর আধিপত্যাধীন রাষ্ট্রের।

রাজার প্রতি প্রজা সাধারণকে চির অনুগত্যাধীনে ও বশবর্তী রাখার জন্য ধর্মের কাণ্ডারি ও ভূস্বামীদের নায়ক বা সেনানায়ক, শাসক বা রাজার পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। রাজার প্রতি প্রজা সাধারণকে চির অনুগত্যাধীনে ও বশবর্তী রাখার জন্য ধর্মের কান্ডারিরা মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রোথিত বিশ্বাসকে ব্যবহার করে প্রচার করা শুরু করে – **ইহলোকের রাজা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই রাজার আদেশকে সর্বশক্তিমান দেবতার আদেশ হিসাবে শিরোধার্য করে নিতে হবে।** কোন কোন দেশে সূর্যকে, কোথাও যিউশকে অলৌকিক জগতের শাসক হিসাবে প্রচার করা হয়। মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদি জনগোষ্ঠীর নেতা আব্রাহাম ও তারপর মোজেস মানারূপে কল্পিত দেবতা জিহোভাকে ঈশ্বর এবং নিজেকে তার প্রতিনিধি ঘোষণা করেছিলেন। এইভাবে একেশ্বরবাদের প্রচলন হতে থাকে। খৃষ্ট, ইসলাম এবং বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের পর বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলে একশ্বেরবাদ প্রচলিত হয়।

আর্থিক সংকট ও যুদ্ধ-বিগ্রহের পাশাপাশি প্রযুক্তির উন্নতি এবং দর্শনিক যুক্তিবাদের বিকাশ ধর্মের কাহিনী নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করে। সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনে দার্শনিকদের প্রয়াস শুরু হয়। অন্য দিকে এই প্রয়াসকে গলা টিপে মারার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মবাদীদের নৃশংস অত্যাচার, জিয়োদানো ব্রুনো, গ্যালিলিও থেকে আজকের যুগের দাভোলকর এর ঘটনা তাঁরই প্রমাণ। **জনসাধারণকে বশীভূত রাখার জন্য ধর্ম হল শাসকশ্রেণীর মুখ্য হাতিয়ার। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সেই হাতিয়ার বার বার ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং সংকটগ্রস্ত শাসকশ্রেণী তাকে নতুন নতুনভাবে শান দিয়ে ধারালো করে তুলছে।**

ধর্মের উদ্ভব, বিকাশ এবং এই হাতিয়ার ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ'র অজানা? ধর্ম আর বিজ্ঞান যে পরস্পর পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান করে এবং পরস্পর বিপরীত দুটি দর্শনের (ভাববাদ এবং বস্তুবাদ) অনুসারী তা কি তাদের অজানা? নাকি এসব জানা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ধর্মের বিরোধী নয়!

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ প্রচারিত এই লিফলেটে বলা হয়েছে যে তারা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের বিরোধী। একটি বিজ্ঞান সংগঠনের প্রচারিত প্রচারপত্র (যা অবশ্যই তাদের নীতি-আদর্শ অনুসারী) এত অবৈজ্ঞানিক অথচ ছলচাতুরিপূর্ণ হতে পারে তা আমাদের জানা ছিল না। অলৌকিকবাদ, ধর্মবাদ তথা ভাববাদ যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখার ভিত্তি তা কি 'বিজ্ঞান মঞ্চ'-র অজানা? পৃথিবীতে প্রচলিত প্রতিটি ধর্মমত তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে এবং অন্য ধর্মমতের বিশ্বাসীকে ঘৃণা করতে শেখায়। ধর্মীয় মৌলবাদ এবং ধর্মান্ধতার উৎস তো এখানেই। উৎসকে আঘাত না করে, নির্মূল করার সংকল্প না নিয়ে এবংপ্রকারান্তরে টিঁকিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে তার ফলাফলের বিরোধীতা করা কি বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয়?

এতো মানবদেহে নানা প্রকার জীবাণুর সংক্রমণকে বিরোধিতা না করে বা প্রশয় দিয়ে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কালাজ্বর, এইডস্ প্রতিরোধ করার কর্মসূচী লাগু করার সরকারী পরিকল্পনার মত অবৈজ্ঞানিক কর্মসূচী।

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী তার শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করে – পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ কি সেই পথেরই অনুসারী?

যে কোন বিজ্ঞান সংগঠন সাধারণ মানুষের ধর্মাচরণে বাধাদান করে না, ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসাবে দেখে। তবে রাষ্ট্র দ্বারা ধর্মাচরণকে উৎসাহদানের বিরোধিতা করে। রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের জন্য আন্দোলন করে। বিজ্ঞান কর্মীরা ধর্মবিশ্বাসী মানুষের বিরোধী নয়। কারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মনে ধর্ম টিঁকে আছে এই জগতের সৃষ্টি ও বিকাশের বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য। শাসকশ্রেণী এবং তার বুদ্ধিজীবীদের ধর্মের মহিমা প্রচারের জন্য। কোন সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজে না পাওয়ার জন্য। তাই প্রতিটি বিজ্ঞান সংগঠনের কাজ হল ধর্মের উৎস ও বিবর্তনের ইতিহাসকে সমাজ বিকাশের সাথে সম্পর্কিত করে জনমানসে তুলে ধরা, এর প্রতিক্রিয়াশীল রূপ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং জনগণকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলা। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করার এই কাজ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ বর্জিত কোন সুবিধাবাদী রাস্তায় হওয়া সম্ভব নয়। ধর্মের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করে ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের বিরোধিতা করা যায় না। ■

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর

মানবজীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ

অস্ট্রেলিয়ায় 'ক্লিনিক্যালি মৃত' মহিলাকে অদম্য প্রচষ্টায় বাঁচালেন চিকিৎসকরা

অস্ট্রেলিয়ায় মেলর্বোনের নিকটবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা ৪১ বছর বয়স্কা শ্রীমতী ভানেসা তানাসিও। তাঁর একটি প্রধান ধমনী (আর্ট্যরি) ব্লক হয়ে যাওয়ায় ভানেসার হাঁট অ্যাটাক হয়। মেলর্বোনের মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্ত্তি করার কিছুক্ষণ পরই ডাক্তাররা তাঁকে ক্লিনিক্যাল পরিভাষায় 'মৃত' বলে ঘোষণা করেন।

তবুও হাসপাতালের কিছু চিকিৎসক বিজ্ঞানের উপর ভরসা রেখে হাল ছাড়েননি। 'লুকাস-২' নামক একটি দুস্প্রাপ্য (সমগ্র অস্ট্রেলিয়াতে একটিই আছে) সংকোচনযন্ত্রের মাধ্যমে ভানেসার মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালন চালু রাখা হয়। হাতে সময় পেয়ে সেই সুযোগে ভানেসার শরীরের ওই ধমনীতে ধাতব জালির তৈরী নল বা স্টেন্ট ঢুকিয়ে ব্লক সরিয়ে দেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ওয়ালি আহসার। তার পর ভানেসার হৃৎপিন্ডে বিদ্যুতের শক দিতেই ৪২ মিনিট পর ফের তা স্বাভাবিক ছন্দে চলতে শুরু করে। ৪২ মিনিট 'ক্লিনিক্যালি মৃত' থাকার পর ফের জীবনে ফিরে আসেন ভানেসা। এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ। এই প্রথম 'লুকাস-২' নামক যন্ত্রটিকে কোন অস্ত্রোপচারের সময় তা সফলভাবে প্রয়োগ করা হল।

চিনে মানুষের কপালে নাক প্রতিস্থাপন

এক ২২ বছরের চিনা যুবকের নাক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল দুর্ঘটনায়। চিনের ফুসিয়ান মেডিক্যাল ইউনির্ভাসিটি ইউনিয়ন হাসপাতালে শল্যচিকিৎসক গুয়ো ঝিহুই যুবকটির নাক প্রতিস্থাপনের দায়িত্ব নেয়। যুবকের পাঁজর থেকে তরুণাস্থি (কার্টিলেজ) সংগ্রহ করে কপালের বাঁদিকের চামড়ার নীচে (মূল নাকের সাথে কপালের চামড়ার গঠনগত মিল থাকায়) বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ছোটখাট কয়েকটি অস্ত্রোপচারে বেড়ে ওঠে নতুন নাক। গোড়ার দিকের চামড়া ও রক্তবাহকের সঙ্গে সংযুক্ত রেখেই গজানো নাকটি ঘুরিয়ে মূল নাকের জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হবে বলে জানান শল্যচিকিৎসক গুয়ো। স্টেম সেলের সাহায্যে নাক প্রতিস্থাপনের ঘটনা বিশ্বে এই প্রথম।

মানব জীবননাশে বিজ্ঞানের ব্যবহার

সিরিয়ায় বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে ১৩০০ নাগরিকের মৃত্যু

গত ২১ শে অগাস্ট সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসের উপকণ্ঠে ঘউটা শরহতলীতে রকেটের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাসের শেল জুড়ে চলে ধারাবাহিক আক্রমণ। এই বিষাক্ত রাসায়িন গ্যাসের আক্রমণে কমপক্ষে ১৩০০ মানুষ নিহত এবং অসুস্থ কয়েক হাজার। অনুমান করা হচ্ছে এই গ্যাস ছিল স্নায়ুতন্ত্রকে সরাসরি আক্রমণকারী গ্যাস সারিন এবং মাস্টার্ড গ্যাস। বিষাক্ত গ্যাস সারিন প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণের ১-১০ মিনিটের মধ্যে সরাসরি স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করলে মৃত্যু নিশ্চিত। অ্যাট্রোপিন এবং ফাইসসস্টিপিন ওষুধ দ্রুত প্রয়োগ করলে রোগীকে বাঁচানোর সম্ভবনা থাকে। অসুস্থ মানুষ অজ্ঞান এবং প্যারালাইজড হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। মাস্টার্ড গ্যাস চোখ, ত্বক, ফুসফুস, মুখ ও গলায় জ্বলন ধরায় এবং এর ফলে ক্যানসার, নিউমোনিয়া, চোখের অসুখ হয়। এই গ্যাসের কোন অ্যান্টিডোট নাই।

বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব এতটাই তীব্র ছিল যে তা ঘউটার পাশাপাশি জামালকা, আরবিন এবং এইন তারমা শহরেও ছড়িয়ে পড়ে।

সরকার বিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দাবী এটা প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের নেতৃত্বে থাকা প্রশাসনের চক্রান্ত। বিদ্রোহীদের সমর্থক মার্কিন সরকার এবং তার সহযোগী বৃটেন এবং ফ্রান্সের প্রশাসন সরকারের সমালোচনা করে সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্রের ভান্ডার ধ্বংস করার জন্য হুমকী দেয়। সিরিয়ার সরকারীপক্ষের বক্তব্য রাষ্ট্রপুঞ্জের অস্ত্র পরিদর্শকদের প্রভাবিত করতে সরকারের বিরুদ্ধে এটা একটা ষড়যন্ত্র। ইরাকের প্রশ্নে নিরব থাকলেও নিজেদের প্রভাবিত এলাকা সিরিয়ার প্রশ্নে মার্কিন হুমকীর বিরুদ্ধে সবর হয়েছে রাশিয়া। তারা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করে। রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিদর্শক দল সিরিয়ার সরকার এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছে কিনা তার প্রমাণ পায় নি। পাল্টা হুমকীতে মার্কিন ও তার সহযোগী শক্তিও এখন নিশ্চুপ। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরগুলি এখন দরকষাকষিতে ব্যস্ত। তাদের দ্বন্দ্বে আরও একবার বলি হলেন সাধারণ মানুষ।

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় অন্যান্য মারণ অস্ত্রের মত রাসায়নিক অস্ত্রপ্রয়োগ নতুন নয়। নাৎসি জার্মানি হাইড্রোজন সায়ানাইড এবং ফসজিন গ্যাস প্রয়োগ করে ৬০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিল। ১৯৬১-৬২ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন বাহিনী এজেন্ট অরেঞ্জ এবং এজেন্ট ব্লু ব্যবহার করে গাছের পাতা ঝরিয়ে ছিল, মানুষ হত্যা করেছিল। ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধে মাস্টার্ড গ্যাস ব্যবহার হওয়ায় ১০ হাজারেরও বেশী মানুষকে হত্যা করা হয়। ১৯৮৪ সালে ভূপালে দুর্ঘটনার নামে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানী ইউনিয়ন কার্বাইড মিথাইল আইসো সায়ানেট (মতান্তরে ফসজিন) কারখানা থেকে লিক করানোয় কয়েক হাজার মানুষ নিহত এবং লক্ষাধিক অসুস্থ হয়।■

আবিষ্কার

পৃথিবী থেকে ৭০০ আলোকবর্ষ দূরের গ্রহটি তার নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে মাত্র সাড়ে ৮ ঘন্টায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাসচ্যুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি পৃথিবী থেকে প্রায় ৭০০ আলোকবর্ষ দূরে আগুনের গোলার মত একটি গ্রহ আবিস্কার করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে কেপলার ৭৮বি। এই গ্রহটি তার নক্ষত্রের (পৃথিবীর যেমন সূর্য) অতি নিকটে অবস্থিত এবং গ্রহটির কক্ষপথ গ্রহটির ব্যার্সাধের মাত্র ৩ গুণ। এত কাছে অবস্থানের জন্য গ্রহটি তার নক্ষত্রকে মাত্র সাড়ে ৮ ঘন্টায় প্রদক্ষিণ করে (পৃথিবী যেখানে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা কিছু মিনিটে)।

নক্ষত্রের এত কাছে অবস্থান করার জন্য গ্রহটির উপরিতল সম্পূর্ণ গলিত (গরম লাভার সমুদ্র) এবং গ্রহের উপরিতলের তাপমাত্রা ২৭৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়েও বেশী।

ম্যাসাসচ্যুসেটস এর পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক জোশ উইন বলেন "অতীতে আমরা এমন গ্রহের অস্তিত্ব জেনেছিলাম যে তার নক্ষত্রকে কয়েকদিনের মধ্যে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু কয়েক ঘন্টায় প্রদক্ষিণ করে এমন গ্রহের উপস্থিতি আছে তা আগে জানা ছিল না। এটা সত্যিই বিস্ময়কর।"

প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিজ্ঞান

পাকিস্তানে ভূমিকম্পের পর আরব সাগরে জেগে উঠল কাদাপাহাড়ের দ্বীপ

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের বালুচিস্তানে ৭.৭ তীব্রতার ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃত ৩৫০, আহত প্রায় ৫০০, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ মানুষ। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে বালুচিস্তানের আওয়ারন থেকে ৬৯ কি.মি দূরে মাটি থেকে মাত্র ১৫ কি.মি গভীরে (স্বল্প গভীরতার) ছিল ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল।

প্রবল এই ভূমিকম্পের ফলে ভূস্তরের ফাটল দিয়ে উঠে আসা গরম কাদা (মাড ভলক্যানো) উপরে উঠে এসে আরব সাগরের গোয়াদরের কাছে প্রায় ২০০ মিটার লম্বা, ১০০ মিটার চওড়া এবং প্রায় ১০-২০ মিটার উঁচু কাদামাটির দ্বীপের জন্ম দিয়েছে।

পাকিস্তানে জিওলজিক্যাল সার্ভের ডেপুটি ডিরেক্টর আনওয়ার হোসেন সংবাদ মাধ্যমকে জানান "ওটা কোন দ্বীপ নয়, কাদার পাহাড় (মাড ভলক্যানো)। যাকে দেখে মনে হচ্ছে দ্বীপের মতো। বড় ধরণের ভূমিকম্পের পরে এমন কাদার পাহাড় তৈরী হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আগেও ১৯৪৫ সালে ভূমিকম্পের পরে ওই অঞ্চলে এমন ভূখন্ড তৈরী হয়েছিল। পরে তা মিলিয়ে যায় সমুদ্রে।" স্থানীয় মানুষরা জানান ১৯৬৮ সালেও ভূমিকম্পের পর আরব সাগরে এমন ভূখন্ড তৈরী হয়ে বছর খানেকের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে পাকিস্তানের ওই অঞ্চলে আরব প্লেট এবং ইণ্ডিয়ান প্লেট (মহাদেশীয় অংশ) সীমান্তএলাকা। এই অঞ্চলে প্রতিনিয়ত দুই টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষ হচ্ছে। এর ফলে নিয়মিত ভূমিকম্প হচ্ছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল মহাদেশে হলেও সমুদ্রে পৌঁছালো কিভাবে? এর উত্তরে জি এস আই-এর প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল মনোরঞ্জন কয়াল বলেন "ভূমিকম্পের ফলে মাটির নীচে পাথরের স্তরে যে ফাটল তৈরী হয় তা কেন্দ্রস্থল থেকে চারদিকে ১৫০ কি.মি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। তাই ওই ফাটল সমুদ্রে পৌঁছে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।"

ইন্দোনেশিয়ায় অতিসম্প্রতি ২০০৬ সালে ২৯শে মে এক মাড ভলক্যানো তৈরী হয়েছিল। ভারতের আন্দামানেও এমন মাড ভলক্যানো রয়েছে। উভয় অঞ্চলই প্লেট সীমান্ত অঞ্চল।

মঙ্গল গ্রহে আরও জল এবং কার্বনের উপস্থিতি – দাবী করল নাসা

মঙ্গলগ্রহের নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মার্স রোভার কিউরিওসিটি নামক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দ্বারা সংগৃহীত মাটি ও বালির নমুনা ক্রোম্যাটোগ্রাফি এবং স্পেকট্রোমেন্ট্রির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে মঙ্গলের মাটিতে আছে অন্তত ২ শতাংশ জল, কার্বন এবং ক্লোরিন। মিহি মাটির নমুনাকে ৮৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করে যৌগের মধ্যে জলের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। মাটি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়িয়ে এসেছে। প্রাণসৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন এবং কার্বনের বিভিন্ন আইসোটোপগুলিও পাওয়া গেছে। এর আগে মঙ্গলের উত্তর মেরুতেও ক্লোরিন এবং কার্বনঘটিত নানা যৌগের খোঁজ পেয়েছিল কিউরিওসিটি বা রোবোযানটি।

মঙ্গলগ্রহের সর্বত্র একজাতীয় কার্বন যৌগের উপস্থিতি এবং জলের সন্ধান মিললে আগামীদিনের প্রাণের সন্ধান মেলাও অসম্ভব নয় বলে মনে করেন রেনসেলিয়ার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞান বিভাগের কর্ণধার লরি লেশিন। ■

সংগঠন সংবাদ

নরেন্দ্র দাভোলকরের হত্যার প্রতিবাদে কলকাতায় দুটি পথসভা

হাতিবাগান

কলকাতার হাতিবাগানে স্টার থিয়েটারের সামনে গত ২৪শে অগাস্ট বিভিন্ন, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন দাভোলকরের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বিজ্ঞান মনস্কও এই সভায় অংশ নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয় এবং বলে মানুষ কুসংস্কারের বশবর্তী হয় নিজের ইচ্ছায় নয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কারণে, অনিশ্চিত জীবন প্রতিদিন আরও অনিশ্চিততর হওয়ার কারণে।

কলেজ স্ট্রীট

দাভোলকরের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে দেশের সমগ্র প্রগতিশীল বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা। এরই অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন যৌথভাবে কলেজস্ট্রিট, কফিহাউজের সামনে গত ১১ই সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় এক পথসভার আয়োজন করে। স্বাভাবিকভাবেই কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির বিষয়গুলি উঠে আসে। এক বক্তা বলেন, "ধর্ম মানবজীবনের আশ্রয় তবে তাকে ব্যবসায় পরিণত করা উচিত নয়।" প্রতি উত্তরে এক বক্তা মার্কসের উদ্ধৃতি তোলেন "ধর্ম হল আফিং, মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য।" অন্য এক বক্তা বলেন "ধর্মকে ব্যবসার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।" কেউ আবার বলেন– "মার্কস ছিলেন একজন মহান দার্শনিক; একদল মানুষ তাঁকে রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রচার করে।" আর এক বক্তা বলেন – "গণতন্ত্র কথাটাই ভেক। ইতিহাসে দাসমালিক, জমিদার, রাজা সবার থেকে পুঁজিতন্ত্রে শিল্পপতিরা বহুগুণে শক্তিশালী। বৈষম্যও বহুগুণ। সে ব্যবস্থায় গণতন্ত্র কিভাবে প্রতিষ্ঠা হতে পারে?" কুসংস্কারের প্রশ্নে গনেশের দুধ খাওয়ানো, জ্যোতিষ, ম্যাজিক রেমেডি প্রভৃতি প্রসঙ্গ আসে। এবং আইন করে এগুলো বন্ধ করবার দাবী ওঠে। 'বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে বলা হয়– " আইন করে এটা বন্ধ করা যাবে না। আইন হলে তখন বেআইনি ভাবে করবে। একাজে আমরা এর ভুরি ভুরি উদাহরণ দেখি। এবং বেআইনি কাজও এই সমাজে আশ্রয় পায়। তাই আইনের দাবী আমরা করতে পারি, কিন্তু মনে রাখতে হবে– সমাজের কুসংস্কার টিকে থাকার যে ভিত্তিগুলি রয়েছে, সেগুলি প্রতিমুহূর্তে বিকশিত হচ্ছে এবং সুচতুরভাবে কাজে লাগাচ্ছে একদল লোক, যারা কিনা ব্যবস্থার রক্ষক। তাই বিজ্ঞান আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে হবে। সমাজটা যে আসলে শ্রেণীবিভক্ত এবং কুসংস্কার টিকিয়ে রাখার পিছনে একটা শ্রেণীস্বার্থ কাজ করে - দাভোলকরকে হত্যা এটা আরও প্রত্যক্ষভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিলো। তাই সত্যিকারে সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থে যে বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ আছেন তারা এতে ভয় পায়নি, ভয় পাবে না। বরঞ্চ আরও প্রতিবাদমূখর হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবে। দাভোলকরের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

মিছিলে প্রচারিত যৌথ প্রচারপত্রে বলা হয় "দেশজুড়ে পরিব্যাপ্ত নানা চেহারার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পঁচিশ বছর ধরে ক্লান্তিহীনভাবে লড়াই করতে থাকা সৈনিক নরেন্দ্র দাভোলকর (১৯৪৫-২০১৩) গত ২০ অগাস্ট, ২০১৩ মহারাষ্ট্র-র সাতারায় খুন হলেন। আততায়ীরা অজ্ঞাত, এখনও কেউ ধরা পরেনি।"

"নরেন্দ্র দাভোলকর হত্যা আমাদের কাছে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বিশেষের ওপর আক্রমণ ও হত্যামাত্র নয়, তাঁর আজীবন চর্চিত নীতি-আদর্শর ওপর–যে নীতি-আদর্শয় সহ-বিশ্বাসী আমরাও–আক্রমণ ও তাকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টাকরব। তাই, এই হত্যার প্রতিবাদ আমাদের অবশ্য-কর্তব্য। আমাদের চোখে নরেন্দ্র দাভোলকর একজন শহীদ। তাঁকে শহীদের মর্যাদায় শ্রদ্ধা জানানো আমাদের দায়, আমাদের দায়িত্ব।"

"কিন্তু এইখানেই আমাদের সব কাজ শেষ হয়ে যায় না। শ্রী দাভোলকরের অনারব্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ। অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার এই রাজ্য সমেত সারা দেশের সমাজ জীবনে এখনও গভীরভাবে প্রোথিত। তাই কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি:

শ্রী দাভোলকর প্রস্তাবিত বিলটির অসংশোধিত রূপকে আদর্শ করে অনুরূপ বিল কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভায় পেশ করতে হবে এবং সেটিকে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

যতদিন না আইন হচ্ছে, গণমাধ্যমে, বিশেষ করে সিনেমায়, দূরদর্শন-ধারাবাহিকে ও বিজ্ঞাপনে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, মিথ্যা তত্ত্ব ও তথ্যর প্রচার নিষিদ্ধ করতে হবে।

কেন্দ্র সরকার ও মহারাষ্ট্র সরকার উভয়কেই শ্রী দাভোলকর হত্যার তদন্ত বিচারও দোষীদের শাস্তির ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। ■

বনগাঁ-তে আর্সেনিক নিয়ে সেমিনার

'পুরাতন বনগাঁ হাইস্কুল'র ছাত্র-ছাত্রীরা স্থানীয় যুবকদের নিয়ে কবি সুকান্তর আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে, একটি দেওয়াল পত্রিকা বের করেছে। নাম দিয়েছে– 'ছাড়পত্র'।

সুকান্তর আদর্শকে কুর্নিশ জানাতে ১৬ই আগস্ট (সুকান্ত র জন্ম : ১৫ই আগস্ট, ১৯২৬) সারাদিনব্যাপী ছিলো তাদের আয়োজন। 'বিজ্ঞান মনস্ক'কেও তারা শরিক করে। সকালের প্রভাতফেরী দিয়ে তাদের দিন শুরু হয়। তারপর চারটি টিমের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ। এরপর 'ছাড়পত্র' উদ্বোধন, আবৃত্তি, গান, নাচ, বক্তব্য পুরষ্কার বিতরণ চলতে থাকে-স্কুল প্রাঙ্গনে সুসজ্জিত মঞ্চে। সুকান্তর আদর্শ, মেহনতি-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি তার সমবেদনা ও স্বপ্নকে তুলে ধরাই ছিলো অনুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র।

বিপুল ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি আর আয়োজক ছাত্র-যুবদের আন্তরিক কর্মতৎপরতা পুরো অনুষ্ঠানকে ভিন্ন মাত্রা দেয়। 'বিজ্ঞান মনস্ক' সেখানে আর্সেনিক সমস্যার উপর সেমিনার এবং বিজ্ঞানের খেলা দেখায়। বনগাঁ একটি আর্সেনিক কবলিত অঞ্চল। এই অঞ্চলের মানুষ আর্সেনিক সমস্যায় প্রবলভাবে আক্রান্ত। কিন্তু আর্সেনিক নিয়ে সেমিনারটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। এ বিষয়ে আমাদের আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। তবে মাত্র পঁচিশ মিনিটের 'বিজ্ঞানের খেলা' অনুষ্ঠানটি ছিলো খুবই গতিময় ও চিত্তাকর্ষক। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও ছিলো প্রবল কৌতুহল।

জনতার উপর পুলিশী নজরদারী – দুটি সেমিনারে বিজ্ঞান মনস্ক

স্নোডেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি'র (NSA) একজন কনট্রাক্ট বেসিসে টেকনিশিয়ান কর্মী ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি প্রকাশ করে দিলেন – আমরা যে টেলিফোন, ইন্টারনেটে যোগাযোগের জন্য কথা বলি, টেক্সট, ভিডিও আদান-প্রদান করি – সব তথ্য তাদের নথিভূক্ত রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার নামে পুলিশী নজরদারির জন্য মার্কিন সরকারের এই যে যোজনা – ভারত সরকারও তার শরিক। এই যোজনা কেবল নাগরিক অধিকারের উপরই হস্তক্ষেপ নয়, ব্যক্তি ও পরিবারের প্রাইভেসীর (একান্তভাবে গোপনীয় বিষয়গুলি) অধিকারকেও লঙ্ঘন করে। গণসংগঠন ও রাজনৈতিক সংগঠনের এমনকি বিভিন্ন দেশের সার্বভৌম অধিকারের উপরও এটা একটা হস্তক্ষেপ। তাই দিকে দিকে এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

নৈহাটি

'তথ্যপ্রযুক্তি ও স্নোডেন' শিরোনামে গত ১০ই আগস্ট উত্তর চব্বিশ পরগনার নৈহাটিতে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে 'পরিপ্রশ্ন' পত্রিকা। উদ্যোক্তারা বলেন আমেরিকা তথা ভারতের নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভেঙে যেভাবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যে লেখালেখি হচ্ছে আজকের

আলোচনা তার বাইরের আলোচনা।

সভায় মূল আলোচক ছিলেন অরূপ ঘোষ। তিনি বলেন যে এই নজরদারীর সাথে মূলতঃ তথ্যপ্রযুক্তির যোগ আছে। এই নজরদারীর মূল কারণ হল ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে মানুষকে পশ্চাদমুখী করে তোলা যেমন জাতি-ভাষা ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে মদত করা, মানুষকে বেশী বেশী করে পণ্য করে তোলা, ভ্যালু অ্যাডেড চেইন এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ব্যবসার প্রসার ঘটানো এবং মাওবাদীসহ নানা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে উৎসাহ প্রদান করা।

বক্তার বক্তব্য অধিকাংশের বোধগম্য এবং যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি। একজন প্রশ্ন করেন "এত কিছুর পরও কি পুঁজিবাদ তার সংকট কাটিয়ে উঠতে পারছে?" জবাবে অরূপবাবু বলেন "দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।" বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিনিধি আলোচককে প্রশ্ন করেন– "নজরদারীর পিছনে প্রতিবাদী এবং বিপ্লবী শক্তিকে প্রতিহত করার কোন উদ্দেশ্য আছে কি?" জবাবে আলোচক রাগত স্বরে জবাব দেন "নজরদারীর পেছনের মূল কারণকে আড়াল করার জন্য এসব ভ্রান্ত প্রচার করা হচ্ছে।" আমাদের প্রতিনিধি আরও প্রশ্ন করেন "এই নজরদারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তার উপরও আঘাত হানছে না কি?" প্রশ্ন শুনে আলোচক আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং মন্তব্য করেন "মানুষকে সামাজিক ভাবনায় উন্নীত করার বদলে ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ভাবনায় ঠেলে দেওয়াই এইসব প্রশ্নের উৎস।

আমাদের প্রশ্নগুলি আলোচককে বিব্রত করছে এবং উত্তরে তিনি সমগ্র আলোচনার মত অবিবেচক এবং অবৈজ্ঞানিক উত্তর দিচ্ছেন দেখে এবং সময়ের অভাবে তাঁকে আর বিব্রত করা হয়নি।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং শ্রেণীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে যুগে যুগে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে তার জন্য নজরদারী চালিয়ে আসছে নানারূপে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শাসকশ্রেণী যে গণতন্ত্র এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলে, শোষিত মানুষের জন্য তা যে কতটা ভাঁওতার এই আলোচনায় সেটা উঠে আসেনি। নজরদারী নিয়ে হইচই হচ্ছে বিরোধী শাসকদের উপর তা করার কারণে। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে বিশেষত বিদ্রোহী জনতার উপর নজরদারীতে শাসকশ্রেণীর কোন অংশের কোন দ্বিমত নাই।

কলকাতা

সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটিও এই পুলিশী নজরদারির বিরুদ্ধে গত ১৮ই আগস্ট কলেজ স্কোয়ার এলাকার থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলঘরে একটি জনসভার আয়োজন করে। বিভিন্ন সংগঠন এখানে উপস্থিত ছিলো। প্রত্যেক সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্যে এই পুলিশী নজরদারির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। অনুষ্ঠানে 'বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিনিধি বলেন– "বিজ্ঞানের এই যে বাড়-বাড়ন্ত, নতুন নতুন আবিষ্কার, সেখানে সাধারণ মানুষের অবদানই সর্বাধিক। আপনার-আমার ঘরের ছেলেমেয়েরা এই যে বিজ্ঞানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে – একটি উদ্দেশ্যে – বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি যেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রাজত্ব। সাম্রাজ্যবাদ আবার নিজের সংকটের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। এই সংকটাপন্ন সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে টিকিয়ে রাখতে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। পুলিশী নজরদারিতে প্রিজম টেকনলজির ব্যবহার তারই একটি উদাহরণ। বিজ্ঞান মনস্ক'র এখানেই ঘোরতর আপত্তি ও প্রতিবাদ। বিজ্ঞান কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। বিজ্ঞান প্রতিটি মানুষের সাধারণ সম্পত্তি। তাই বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যানের কাজে লাগাতে হবে।" পুলিশী নজরদারির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন "এই জনসভা আগামীদিন যে পদক্ষেপ নেবে, বিজ্ঞান মনস্ক সেখানে সাথী হিসেবে থাকবে; সংগ্রামের শরিক হিসেবে থাকবে"।

ধর্ম প্রগতির অন্তরায় - আলোচনাসভায় বিজ্ঞান মনস্ক

গত ২৪শে আগষ্ট 'ঝাড়খন্ড যুক্তিবাদী মঞ্চ'-র ডাকে 'বিজ্ঞান মনস্ক' একটি আলোচনা সভায় অংশ নেয়। কলকাতার কলেজ স্কোয়ার সংলগ্ন সংস্কৃত কলেজের সামনে একটি হলে। সেখানে আরও ৬/৭ টি গণসংগঠনও উপস্থিত ছিলো। আলোচনার বিষয় নির্ধারিত হয়েছিলো – "ধর্ম প্রগতির অন্তরায়"-এই শিরোনামে। আলোচনাটি খুব বিশৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক অনৈক্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। বিজ্ঞান মনস্কের পক্ষ থেকে বলা হয়– ধর্ম কোন বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা নয়। আর ধর্মকে ঝেঁটিয়ে তাড়ানোও সম্ভব নয়। প্রত্যক ধর্মেরই একটি ইতিহাস আছে। মানুষই ধর্মকে সৃষ্টি করেছিলো এক একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ স্বার্থে। কিন্তু সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জ্ঞান ও ধারণা বৃদ্ধি পেতে থাকে। না জেনে যে বিষয়কে একসময় সত্য মনে করা হত সেটাই আবার পরে মিথ্যা বলে প্রমাণিত

হয়। কিন্তু ধর্ম কতগুলি অপরিবর্তনীয় বিধি-আকারে থেকে যায়। সমাজের পরিবর্তনশীলতার সাথে এই যে দ্বন্দ্ব, তা মাঝে মাঝে চরম পর্যায় ওঠে কিন্তু ধর্ম বিদায় নেয় না। কারণ এর ভিত্তিমূল রয়েছে এই সমাজেই। রাষ্ট্রশক্তি এবং ভাববাদীরা মানুষের দুর্বলমনে একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চালায় নানা প্রচেষ্টা। যাতে মানুষ ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হতে শেখে। এই সমাজ থেকে না পাওয়াকে, চরম দমন পীড়ন ও শোষণকে তার নিয়তি বলে ভাবতে বাধ্য হয়। এতে করে এই সমাজের যারা শাসক - পরিচালক তারা নিশ্চিন্তে শোষণ চালিয়ে যেতে পারেন। তাই ধর্ম নিয়ে আজও এত উন্মাদনা, এত কুসংস্কার। ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা – রক্তপাত। নিঃসন্দেহে এটা প্রগতির অন্তরায়। আর এই বাধাকে দূর করতে সমাজের ভিত্তিমূলকে ধরেই টান মারা চাই। মানুষের অসহয়তাকে ভিত্তি করে যে ধর্মীয় ধারণা টিঁকিয়ে রাখা হয়, যেদিন সমাজ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করতে পারবে, শ্রমের সঠিক মূল্য এবং খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সাধারণ মানুষের নাগালে এনে দিতে পারবে, সেদিন ধর্মকে জোড় করে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে না, স্বাভাবিক নিয়মেই ধর্মের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তাই প্রত্যেক গণসংগঠনের বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে বিজ্ঞানের নিয়মকে (প্রকৃতির নিয়ম) ভিত্তি করে সামাজিক আন্দোলনকে পরিচালনা করা উচিত। বিজ্ঞান মনস্ক'র এই বক্তব্যের সাথে অনেকেই সহমত পোষণ করেন।

ভাববাদ ও বস্তুবাদ প্রশ্নে বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর অঞ্চলের সংগঠন 'নাস্তিক'-এর পক্ষ থেকে বলা হয় - "বস্তু ও চিন্তার আন্তঃসম্পর্ক গুলিয়ে ফেললে সেটা না বস্তু দেখায়, না ধর্ম দেখায়।" তারপর অন্যান্য বক্তার বক্তব্যেও বিষয়গুলি বার বার বিভিন্ন আঙ্গিকে উঠে আসে। চরম অনৈক্যের জায়গা থেকে শুরু করলেও বিষয়গত দিক থেকে একটা ঐক্যতায় পৌঁছায়।

পুরুলিয়ায় ভগৎ সিং-এর স্মৃতিতে স্লাইড শো

পুরুলিয়া জেলায় হুলকা গ্রামের তরুন-যুবরা একত্রিত হয়ে (২০১১ সালে) গঠন করেছিলো 'শহীদ ভগৎ সিং স্মৃতি উদযাপন কমিটি'। তারাই বিগত বছরের মত এবছরও ভগৎ সিং-এর জন্মদিনকে (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) কেন্দ্র করে আয়োজন করেছিলো (২৭ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩) একটি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দু'দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে 'বিজ্ঞান মনস্ক' উপস্থিত ছিলো। প্রথম দিন বিভিন্ন গ্রামের ৮টি ফুটবল টিমের মধ্যে খেলা হয়। সেখান থেকে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে দু'টো টিম। পরের দিন ফাইনাল খেলাটি খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এরপর গান, আবৃত্তি, বক্তব্য, কুইজ কনটেস্ট ও পুরস্কার বিতরণ হয়।

যে জিনিসটি বিশেষ প্রসংশার দাবী রাখে – হাতে লেখা, রঙ-বেরঙের কাগজ-কালিতে চিত্রিত 'দেওয়াল পত্রিকা'। সম্পাদকীয় থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয় খাতার মত তৈরী করে বোর্ডে সেটে দেওয়া হয়েছিলো। সত্যিই অপূর্ব। আর, দু'দুবার ঝড়ো বৃষ্টি এসে ওলোট-পালট করে দিয়েছিলো আয়োজনকে। তারপরও কর্মীদের তৎপরতা ও শৃঙ্খলায় মঞ্চসজ্জা থেকে শুরু করে পুরো ব্যবস্থাপনাটাই ছিলো চোখে পড়ার মত।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে - 'বিজ্ঞান মনস্ক' পরিবেশন করল ভগৎ সিং-কে নিয়ে বিশেষ সেমিনার, স্লাইড শো-র মাধ্যমে। প্রজেক্টরের মাধ্যমে এধরনের অনুষ্ঠান গ্রামবাসীদের কাছে নতুন। খোলা আকাশের নিচে, মাঝে মাঝে ঝির ঝিরিয়ে বৃষ্টি, পায়ের তলায় ভিজে ওঠা মাটি - কাদা সব উপেক্ষা করে, একনাগাড়ে দাড়িয়ে থেকে তারা সেমিনারটি টানটান আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করল। মানুষের উৎসাহ দেখে পূর্বপরিকল্পিত একঘন্টার সেমিনারকে আমরা দু'ঘন্টায় নিয়ে গেলাম। কাউকে চলে যেতে দেখলাম না। তারপর 'চট্টগ্রাম' চলচিত্রটি দেখানো হল। সেমিনার দেখে গ্রামের মানুষ মুগ্ধ। আমরাও বিস্মিত। পরে জানলাম - তারা এই সেমিনার থেকে যতটুকু পায়, মণিমুক্তোর মত আহরণ করতে চেষ্টা করেছিলো। ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী কর্মধারা নিয়ে তাদের মধ্যে চর্চা হয়। ভগৎ সিংকে নিয়ে বাংলায় প্রকাশিত অনেক বইও তাদের ছোট্ট লাইব্রেরীর সংগ্রহে রয়েছে।

শিলিগুড়িতে ঝড়ে উপড়ে যাওয়া গাছের 'দৈবশক্তি বলে' মাটিতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অনুসন্ধান!

গত ২১ শে সেপ্টেম্বর বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে আমরা শিলিগুড়ির অদূরে সুকনা-মধুবন হয়ে ঠিক শিলিগুড়ি টী এস্টেট (স্টেট হাইওয়ে, আর্মি বেল্ট) সড়কের ধারে এক 'অলৌকিক'(?) ঘটনা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। দুই তিন সপ্তাহ আগে প্রবল ঝড়ে বেশ কিছু গাছ ঐ অঞ্চলে পড়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটি বিশাল গাছ স্টেট হাইওয়ের উল্টোদিকে শিমূলবাড়ি চা বাগানে অন্য একটি গাছকে ধাক্কা

দিয়ে পড়ে গিয়েছিল। সারাদিন ধরে স্থানীয় মানুষজন গাছটির ডাল-পালা ছোট ছোট করে কেটে নিয়ে যেতে থাকে। দেখতে দেখতে গাছটি একটি শুকনো কাঠের গুঁড়ির মত হয়ে যায়– বাকিটা আবার পরেরদিন কাটা হবে বলে। কিন্তু পরের দিন সকালবেলা এসে দেখা যায় গাছটি সোজা হয়ে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে রটনা হয় - কোন 'দৈবশক্তিবলে' গাছটি মাটির উপর দাঁড়িয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে লোকজন জমা হয়ে যায় এবং গাছটিকে লাল শালু দিয়ে জড়িয়ে পূজা আরম্ভ হয়ে যায়।

আমরা দেখলাম এত নির্দয়ভাবে গাছটিকে কাটা হয়েছে যে বিশাল গাছটি একটি কাঠের গুঁড়িতে পরিণত হয়েছে। এতে একটিও ডালপালা বা পাতা তো দুরের কথা ছাল-বাকলও নেই। গাছটির মধ্যে কোন জীবনের লক্ষণ নেই, অথচ 'দৈববলে পুর্নজন্ম হওয়া' গাছকে ঘিরে বালি-পাথর স্তুপিকৃত করা হয়েছে। পথ চলতি মানুষজন গাড়ি থামিয়ে নেমে গাছের গোড়ায় টাকা পয়সা, ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করছে। এর মধ্যে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ – শিলিগুড়ির নামজাদা ডাক্তারও আছেন।

সন্ধ্যে নেমে এল, আমরা তখনও দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। একটু দূরে ক'জন স্থানীয় যুবক মলিন পোষাক এবং ক্লান্ত চোখে পুরো ব্যাপারটা দেখছিল। ভিড় পাতলা হতেই একজন উঠে গাছের নীচ থেকে টাকা পয়সা পকেটে গুঁজে অন্যদের নিয়ে হাঁটা দিল। কানে এল, 'চল দারু পিয়েগা'।

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অবস্থার বদল হয়নি। পূজো চলছে, রোজগারও হচ্ছে কিন্তু মন্দির এখনও হল না কেন? খোঁজ নিয়ে জানা গেল গাছটি চা-বাগানের জমির মধ্যে পড়েছে। বাগানের মালিক - ম্যানেজারদের বাধায় স্থায়ী মন্দির না হলেও অস্থায়ী মন্দির নিয়ে ব্যবসা চলছে।

নেহাই সাংস্কৃতিক সংগঠনের দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান

গত ২৮ শে অগাস্ট কলকাতার উপকণ্ঠ বেলঘরিয়ার রথতলায় নেহাই সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে 'সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা' অনুষ্ঠিত হয়। ওই সন্ধ্যায় বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে কবি মনীভূষণ ভট্টাচার্যকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক মান খুব উন্নত না হলেও উৎসাহের অভাব ছিল না।

দ্বিতীয় দিন ২৯ শে অগাস্ট দুপুর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে নানা বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ'র প্রতিনিধি 'যুদ্ধ পরিবেশ ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। সমুদ্র গুহ-র আলোচনা ছিল 'বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি', সৌমিত্র ঘোষদস্তিদার 'টি ভি-তে সিরিয়ালের সন্ত্রাস' প্রসঙ্গে বলেন। দেবাশীষ ভট্টাচার্য বলেন 'ধর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকা' প্রসঙ্গে। সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সায়েন্স এন্ড সোসাইটি-র অশোক মুখোপাধ্যায় বলেন "সংস্কৃতিতে বিশ্বায়ন বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ" শিরোনামে। শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের এক জায়গায় বলেন "কার্ল মার্কস বলেছিলেন দুনিয়ার মজদুর এক হও। আমাদের আজ বলতে হবে দুনিয়ার সাংস্কৃতিক কর্মী এক হও।" সভায় উপস্থিত বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিনিধারা তখন প্রশ্ন আকারে বলেন "দুই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত কি একই? সমাজে বিরাজমান সাংস্কৃতিক কর্মীদের নীতিগত ভিত্তি ছাড়া কি ঐক্যবদ্ধ করা যায়? প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধারার সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐক্যবদ্ধকরণের ডাক আর দুনিয়ার মজদুরদের ঐক্যবদ্ধকরণের ডাক কি সমার্থক?" উত্তরে আলোচক যুক্তি ও ব্যাখ্যা ছাড়াই দুই-ই সমার্থক বলে মন্তব্য করেন। বিজ্ঞান মনস্ক-কে সভায় 'শ্রেণীসংগ্রাম ও বিজ্ঞান আন্দোলন' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এতজন বক্তার দীর্ঘ বক্তব্য ও আলোচনায় এবং তা নিয়ে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনের ফলে রাত বাড়তে থাকে। আরও আলোচক বাকী ছিলেন, সকল দর্শকদের আলোচনা গ্রহণ করার অবস্থাও ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা তাঁদের লিখিত বক্তব্য আয়োজকদের কাছে জমা দিয়ে এবং নীতিগতভাবে সমমতের ভিত্তিতে যৌথকাজ হলে তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে চলে আসতে বাধ্য হন।

অন্যান্য সংবাদ ঃ গত ৪-৬ই অক্টোবর সোনারপুর তেমাথায় জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সংগঠন কুসংস্কার বিরোধী এবং খাদ্যে ভেজাল নিয়ে অনুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠানে দর্শকদের মধ্যে সমীক্ষণ সংগ্রহের আগ্রহ লক্ষ করা যায়।

দুর্গাপূজায় ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে কুসংস্কারবিরোধী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। কালীপূজার সময় ঐ অঞ্চলেই পোস্টার প্রদর্শনী করা হয়। ■

-ঃ বিজ্ঞানের খবর ঃ-

জুলাই ২০১৩

২. ● কম্পিউটার মডেলিং এবং সৌর সংক্রান্ত গবেষণায় স্কটিশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে পৃথিবীর অন্তিম সময়কাল পর্যন্ত 'এক্সট্রিমোফাইল' জীবাণুরা বেঁচে থাকতে পারবে। এই জীবাণুরা অতি কঠিনতম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বেঁচে থাকতে সক্ষম। (বিবিসি)

৩. ● জাপানের বৈজ্ঞানিকরা স্টেম সেল থেকে লিভার তৈরী করেছেন এবং সেটি ইঁদুরের দেহে প্রতিস্থাপন করেছেন। এটি পুনরুৎপাদনশীল (রিজেনারেটিভ) চিকিৎসাবিদ্যার জগতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। (দ্য গার্ডিয়ান)

● দুজন রোগীর দেহে অস্থি মজ্জা (বোন ম্যারো) প্রতিস্থাপন করে অ্যান্টিরিট্রোভাইরাল চিকিৎসার সাহায্যে 'এইচ আই ভি'-এর সমস্ত লক্ষণগুলির নিরাময় সম্ভব হয়েছে। (বিবিসি)

৫. ● বিজ্ঞানীরা এক্স রে ভিডিওর সাহায্যে উড্ডীয়মান বাদুড়ের ডানার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করেছেন। এর থেকে তারা উন্নতমানের উড়ন্ত রোবটের নকশা গঠন করতে সক্ষম হবেন। (বিবিসি)

৬. ● সোলার ইমপাল্‌স উড়োজাহাজ এই প্রথমবার কেবলমাত্র সৌরশক্তির সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উড়েছে। (এনগ্যাজেড)

● বিজ্ঞানীরা আন্টার্কটিকায় 'লেক ভোস্তক'-এ এক ভিন্ন প্রজাতির জীবাণুর সন্ধান পেয়েছেন যেগুলি ১৫ মিলিয়ন বছর ধরে বরফের তলায় চাপা পড়ে ছিল। লেকের জলের নমুনা সংগ্রহ করে তাতে ৩০০০ ক্ষুদ্র জীবের ডি এন এ-র সন্ধান পাওয়া গেছে। (ডেইলী টেলিগ্রাফ)

৮. ● বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, অতিক্ষুদ্র মরছে কণার (ন্যানোপার্টিক্‌ল অফ রাস্ট) সাহায্যে সূর্যালোক এবং জল থেকে হাইড্রোজেন জ্বালানী বানানো সম্ভব। (বিবিসি)

১০. ● ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক প্রায় নির্ভুল অপটিক্যাল ল্যাটিস (Optical lattice) ঘড়ি আবিষ্কার করেছেন। এটি ৩০০ মিলিয়ন বছরে মাত্র ১ সেকেন্ড স্লো হয়। এই ঘড়িটি আজকের দিনের পারমাণবিক ঘড়িকে বদল করতে সক্ষম। (ডেইলী মেল)

১৫. ● ভূকম্পবিদরা বলেছেন আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের আগে ছোট ধরনের ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় এবং এই ধরনের ভূমিকম্পের স্পন্দনের দ্রুততা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনাটিকে সিস্‌মিক স্ক্রীম বলা হয়, যার মাধ্যমে অগ্নুৎপাতের ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভব। (গ্লোবাল পোস্ট)

১৬. ● বৈজ্ঞানিকরা কৃত্রিম পারঅক্সিজোমস (peroxisomes) তৈরী করেছেন। এগুলি বিষাক্ত অক্সিজেন যৌগের পরিমাণ কমাতে সক্ষম। ফলে এগুলি দ্বারা অভিনব ওষুধ তৈরী করে যেতে পারে যা শরীরের জীবন্ত কোষের মধ্যেও সরাসরি কাজ করতে পারে। (গ্লোবাল পোস্ট)

১৭. ● ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা একটি অত্যাধুনিক সার্জিক্যাল ছুরি আবিষ্কার করেছেন। এটি মাস স্পেকট্রোমিটার-এর সাহায্যে দ্রুত ক্যানসার আক্রান্ত কোষের সন্ধান দিতে পারে। এর ফলে শল্যচিকিৎসকরা অতি দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে ক্যান্সারের নিরাময় করতে পারবেন। (রয়টার)

২১. ● ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা দৃষ্টিহীন ইঁদুরের চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করেছেন। দৃষ্টিহীনতা দূর করতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত অক্ষিপটের (ড্যামেজ্‌ড রেটিনা) নিরাময় সম্ভব করেছেন স্টেম সেল দ্বারা। এই পদ্ধতি মানব শরীরেও প্রয়োগ করে সাফল্য পাওয়া সম্ভব। (নিউ সায়েন্টিস্ট)

● আমেরিকার বিজ্ঞানীরা নমনীয়, সূক্ষ্ম 'ইলেকট্রনিক স্কিন' প্রস্তুত করেছেন। এটি মানুষের চামড়ার মত দেখতে। এটির দ্বারা মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশের প্রেসার মাপা সম্ভব। (সায়েন্স ডেইলী)

২২. ● বিজ্ঞানীরা লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের তথ্য যাচাই করে বলেছেন এটি একটি দুর্লভ কণার ক্ষয়ের ঘটনা। ফলে সুপারসিমেট্রি থিওরি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের সন্দেহ জেগেছে। (সায়েন্স ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট)

২৫. ● বিজ্ঞানীরা সফলভাবে ইঁদুরের মস্তিষ্কে মেকি স্মৃতি (ফল্‌স মেমোরি) স্থাপন করেছেন। এটি থেকে মানুষের স্মৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আরো বেশি করে জানতে পারবেন। (বিবিসি)

২৬. ● বিজ্ঞানীরা জিএম-ফ্রি পদ্ধতির দ্বারা নাইট্রোজেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এর ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল উদ্ভিদ প্রজাতি বায়ুমন্ডল থেকে মোট প্রয়োজনের ৬০ শতাংশ নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে সমর্থ হবে। (phys.org)

৩১. ● লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে বি-মেসন-এর গণনা থেকে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের বাইরে নতুন পদার্থবিদ্যার খোঁজ মিলেছে। (হাফিংটন পোস্ট)

অগাস্ট ২০১৩

১. ● ইনজেনোল ম্যাবিউটেট-এর (Ingenol mebutate) রাসায়নিক সংশ্লেষ এই প্রথম সম্ভব হয়েছে সফলভাবে। এই যৌগটি ইউফোরবিয়া (Euphorbia) গোত্রের উদ্ভিদ। এটির মধ্যে কর্কট রোগ প্রতিরোধকারী (অ্যান্টিকার্সিনোজেনিক) বৈশিষ্ট্য আছে বলে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন। (স্ক্রিপস রিসার্চ ইন্সটিটিউট)

৫. ● জাপানের একটি কোম্পানি পুনর্ব্যবহার যোগ্য একটি ত্বক-পট্টি তৈরী করেছেন যা উচ্চ রক্তচাপ বিশিষ্ট রোগীদের উপর ব্যবহার করা হয়। পট্টিটি রক্ত প্রবাহে অবিরত বায়োস্পোরল নির্গত করার মাধ্যমে রক্ত চাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এটি উচ্চরক্ত চাপে ব্যবহৃত ওষুধের চেয়ে অনেক কার্যকরী বলে দাবী করা হয়েছে। (ডেইলী এক্সপ্রেস)

৭. ● একটি নতুন ডিপ ব্রেন সিমুলেশন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে লিপিবদ্ধ করতে এবং থেরাপি করতে সক্ষম। এই ব্যবস্থা থেকে আমরা দেহের স্নায়ু এবং মানসিক রোগ সম্পর্কে জানতে পারবো। (এম আই টি)

১৫. ● ৩৫ বছরে এই প্রথম পশ্চিম গোলার্ধে মাংসাশী প্রাণী ওলিঙ্গুইটো'র (Olinguito) দেখা মিলেছে। (স্মিথ সোনিয়ান)

১৭. ● ইটিএইচ জুরিখ ল্যাবোরেটরিজ-এর চেষ্টায় কম্পিউটেশনাল কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন সম্ভব হয়েছে সলিড-স্টেট সার্কিট-এ। এই কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গেলমেন্ট পদ্ধতির দ্বারা গবেষকরা প্রতি সেকেন্ডে ১০,০০০ কোয়ান্টাম বিট্স টেলিপোর্ট করতে সক্ষম। (ফরব্স্)

২১. ● −২০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় একটি একক কোষযুক্ত প্রাণী বেঁচে থাকতে সক্ষম। এটিই হল কোনও প্রাণীর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার নিম্নতম তাপমাত্রা। (ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট রিসার্চ কাউন্সিল)

২৭. ● জিএসআই-এ সুইডেনের লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা নতুন Ununpentium মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারটি অনুমোদন করেছেন। এটির অ্যাটোমিক নাম্বার ১১৫। (Lund University)

● ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যারয়ের গবেষকরা এই প্রথম হিউম্যান টু হিউম্যান ব্রেইন ইন্টারফেস তৈরী করেছেন। এর মাধ্যমে একজন গবেষক ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে তার মস্তিষ্কের সঙ্কেত পাঠিয়ে অন্য একজনের হাতের বিভিন্ন ভঙ্গী পরিচালনা করতে পারবেন। (ওয়াশিংটন, এডু)

২৯. ● নাসা পৃথিবীতে একটি নতুন গিরিখাতের সঙ্কেত পেয়েছে। এটি ৪৬০ মাইল (৭৫০ কিমি) দৈর্ঘ্য এবং ২৬০০ ফুট (৮০০ মি.) গভীর। এটি গ্রিণল্যান্ডের বরফের আচ্ছাদনের নীচে চাপা পড়ে ছিল। এটি দৈর্ঘ্যে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন-এর থেকেও বড়। (নাসা)

সেপ্টেম্বর ২০১৩

৩. ● SAV001 নামক একট এইচ আই ভি প্রতিষেধক পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যবহার করে দেখা গেছে তা পুরোপুরি সফল এবং যা কোন রোগীর শরীরেই ক্ষতিকর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। এতে রোগীর রক্তে অ্যান্টিবডি উৎপাদনের হার বহুগুণ বৃদ্ধি পেতেও দেখা গেছে। [ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি]

৫. ● স্ট্যানফোর্ডের গবেষকরা গ্র্যাফিন থেকে একটি ট্রান্সিস্টার তৈরীতে ডিএনএ-কে ব্যবহার করলেন। [স্ট্যানফোর্ড]

৬. ● নাসা মারফৎ লুনার অ্যাটমোস্ফিয়ার এবং ডাস্ট এনভায়রনমেন্ট এক্সপ্লোরার (LADEE) উৎক্ষেপণ সম্ভব হল। এটি চাঁদের চারিপাশের অত্যন্ত সূক্ষ্ম বায়ুমন্ডলকেও পরিমাপ করতে সক্ষম। [বিবিসি]

১২. ● নাসা ঘোষণা দিল যে ১৯৭৭ সালে নিক্ষেপিত ভয়েজার ১ সরকারী হিসাব অনুযায়ী সৌরজগতকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল। [নাসা, বিবিসি]

১৯. ● মঙ্গলগ্রহে কিউরিওসিটি রোভার থেকে পাওয়া তথ্য জানাচ্ছে যে ওই গ্রহের বায়ুমন্ডলে মিথেনের পরিমাণ ০.১৮ ± ০.৬৭ পিপিবিভি যা উচ্চমাত্রা ১.৩ পিপিবিভি'র তুলনায় নগণ্য। এই তথ্য মঙ্গলে অনুবীক্ষণিক জীবাণুর উপস্থিতির সম্ভাবনা কমিয়ে দিল। [নাসা]

২৪. ● জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সর্বাধিক ঘনত্ববিশিষ্ট গ্যালাক্সি খুঁজে পেলেন যাতে ১০০০০টি নক্ষত্র চার আলোকবর্ষের মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট। [মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি]

২৬. ● প্যালিয়েন্টোলজিস্টরা একটি চোয়ালের জীবাশ্ম খুঁজে পেলেন যা থেকে বোঝা যায় যে সেটি প্রায় ৪১৯ মিলিয়ন বছরের পুরানো। [এবিসি নিউজ]

অক্টোবর ২০১৩

৭. ● এবছর শারীরবিদ্যা বা মেডিসিন-এ নোবেল প্রাইজ পেলেন জেমস ই রোথম্যান, র‍্যানডি ডব্লু শেকম্যান এবং থমাস সি সুডফ। ভেসিকল কিভাবে কোষপর্দার সাথে মিলিত হয়ে তাদের উপকরণ রিলিজ করে এর উপরই ওনারা গবেষণা করেছিলেন। (দি গার্ডিয়ান)

৮. ● ফ্র্যাঙ্কোইস ইনগ্লার্ট এবং পিটার হিগস্ এবছর

● *শেষাংশ ব্যাক কভার পেজে দেখুন*

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা

●৪৭ পৃষ্ঠার পর

পদার্থবিদ্যাতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। ওনারা সাব এটমিক কণার ভরের উৎস সম্পর্কিত ধারণাকে তাঁদের থিওরেটিকাল গবেষণা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং এটি বর্তমানের সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে 'অ্যাটলাস' ও 'সিএমএস' নামক পরীক্ষা দুটি দ্বারা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে। (নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশন)

৯. ● রসায়নে নোবেল পেলেন এরিয়ে ওয়ারশেল, মার্টিন কারপ্লাস ও মাইকেল লেভিট নামক তিন বিজ্ঞানী। ওনারা জটিল রাসায়নিক সিস্টেমের মাল্টিস্কেল মডেল তৈরীতে সক্ষম হয়েছেন। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১১. ● অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রবিবিশন অফ কেমিক্যাল ওয়েপন্স (ও পি সি ডব্লু) বা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠনকে এবছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। এই সংগঠন একটি কনভেনশনের মাধ্যমে ১৯৭৭ সালে গঠিত হয়। এই সংস্থাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য।

১৬. ● বিজ্ঞানীরা দেহের মধ্যে টিউমারের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণজনিত ১২৭টি পুনর্বার মিউটেটেড জিনকে নির্ধারণ করতে পেরেছেন। (ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি)

১৮. ● গবেষকরা গাট স্টেম কোষের একটি উৎস খুঁজে পেয়েছেন যা কিনা ইঁদুরের শরীরে প্রতিস্থাপনে এক ধরনের ফুলে ওঠা অসুখের নিরাময়ে কাজে লাগতে পারে। (ওয়েলকাম ট্রাস্ট)

২২. ● জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হাজারতম এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার করলেন। (বিবিসি)

২৭. ● আন্তর্জাতিক গবেষকদের একটি টীম অ্যালঝাইমার রোগ সম্পর্কিত জ্ঞাত জিনের সংখ্যা দ্বিগুণ করলেন যার সংখ্যা বর্তমানে ২১। (বিবিসি)

৩১. ● একটি নতুন পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেল যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে উৎপন্ন অতিরিক্ত তাপের কিছু অংশ মহাসাগরগুলি দ্বারা শোষিত হয়। (দি আর্থ ইন্সটিউট, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি)

নভেম্বর ২০১৩

৩. ● পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হল আজকের দিনে।

৫. ● ভারত তার প্রথম মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কিত স্যাটেলাইট 'মঙ্গলযান' উৎক্ষেপণ করল।

৮. ● পৃথিবীর প্রাচীন জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া গেল পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়। অতিসূক্ষ্ম একটি মাইক্রোবায়েল ইঁদুর যা কিনা বেলেপাথরের সাথে সংলগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেল। (এপি নিউজ)

১১. ● একটি নতুন ইমেজিং পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল যার মাধ্যমে বলা যাবে কোন কোন মানুষের হার্ট অ্যাটাকের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। (বিবিসি নিউজ)

–ঃ বিভিন্ন জেলা বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক'র বইয়ের স্টল দেওয়া হচ্ছে ঃ–

শিলিগুড়ি, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম চত্বরে ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই ডিসেম্বর, ২০১৩

সোনাপুর রেল কোয়ার্টার মাঠে ১৩ই ডিসেম্বর থেকে ২২শে ডিসেম্বর, ২০১৩

বেহালা চৌরাস্তায় ১৩ই ডিসেম্বর থেকে ২২শে ডিসেম্বর, ২০১৩

আসানসোল বইমেলা জানুয়ারি, ২০১৪

প্রকাশিত হয়েছে নিঃশেষিত হওয়া সংখ্যাগুলির বাছাই রচনার একটি সংকলন

মূল্য ঃ ২০ টাকা

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫
প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com